আল-আমীন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজ পত্রিকা

নীহারিকা

২০২৩-২০২৪

নীহারিকা

আল-আমীন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজ

যোগীবটতলা, বারুইপুর, কলকাতা-১৪৫

আল-আমীন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজের
শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে

উদ্বোধনী সংগীত

অধ্যাপক রওশন আলী

সভাপতি

তারিখ: ২৮শে জানুয়ারি ২০০৭

এসো সুধীজন, এসো গুণীজন, এসো এসো স্বদেশের মহান প্রান,
এসো এলাকার, এসো বাংলার, এসো ভারতের সুসন্তান।
এসো সুধীজন, এসো গুণীজন, এসো এসো স্বদেশের মহান প্রান।

ফুল্ল কুসুম করিয়া চয়ন, গাঁথিয়াছি মালা পরিয়া যতন,
সে মালিকা সবে দিব উপহার, করগো মোদের আশিষদান।
এসো সুধীজন, এসো গুণীজন, এসো এসো স্বদেশের মহান প্রান।

এ' ভারত ভূমে মোরা অতি দীন, শিক্ষায় মোরা অতিশয় হীন,
তাই ভিক্ষা মাগি আমরা অধীন, করগো মোদের শিক্ষা দান।
এসো সুধীজন, এসো গুণীজন, এসো এসো স্বদেশের মহান প্রান।।

নীহারিকা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
অধ্যক্ষের কলমে	৫
অধ্যাপক আলহাজ্ব রওশন আলী সাহেবের স্মরণে	৬
প্রকৃতি	৮
মনীষী প্রফুল্ল চন্দ্র রায় স্মরণে	৯
তোমার কীর্তির চেয়ে, তুমি হে মহৎ	১২
সম্পর্কের সফলতা	১৪
কালের পথে	১৫
অবলুপ্তি	১৬
সিরাজউদ্দৌলা	১৭
মৃত্যু	১৯
তবেই তুমি	২০
মোবাইল	২০
স্বপ্ন	২১
পোড়ো চাঁদ	২৩
OUR SHADOWS	২৪
ফিরিয়ে দাও	২৫
ইচ্ছে	২৫
গ্রামের ছেলে ভোলা	২৬
শিক্ষার চিন্তা	২৭
NOT SO USUAL	২৮
বিজ্ঞান ও ইসলাম	২৯
বিশ্ব উষ্ণায়ন ও সুন্দরবন সভ্যতা	৩১
আমার কলেজ	৩৫
জঙ্গলে সেই রাত	৩৬
অনাহারী	৪১
আমি পারবো তো ?	৪২
শেষ স্পর্শ	৪৫
মেয়ে	৪৮

কলেজের পত্রিকা বিভাগ

সম্পাদক সম্পাদক- অধ্যক্ষ ড: নুরুল হক

সহকারী সম্পাদক - অধ্যাপক : আজমিরা খাতুন

শায়েরা বেগম

মাতিন আহমেদ

সেখ আসগার আলি

আব্দুল আলি খান

দিলীপ কুমার হালদার

তাজউদ্দিন আহমেদ

আসাদুল্লা খান

নীহারিকা

অধ্যক্ষের কলমে

কলেজ পত্রিকা ' নীহারিকা ' 'র পথ চলা শুরু ২০০৯- ১০ শিক্ষাবর্ষে। তারপর প্রতি বছর পত্রিকার প্রকাশ অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। আমাদের ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ তাদের স্বরচিত মূল্যবান লেখা দিয়ে কলেজের বাৎসরিক পত্রিকা নীহারিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

পত্রিকা কমিটি প্রতি বছরের মত এবছর প্রকাশ করতে চলেছে "নীহারিকা"র ২০২৩ -২৪ সংখ্যা।এ বছর অর্থাৎ ২০২৩ -২৪ শিক্ষাবর্ষে ' নীহারিকা ' তার ত্রয়োদশ সংখ্যার স্মারক। কলেজের পরিচালন সমিতি, অনেকে তাদের সুন্দর ও উন্নতমানের প্রবন্ধ, কবিতা, ইত্যাদির মাধ্যমে পত্রিকা আকর্ষণীয় করতে সহযোগিতা করেছেন।

আমি পত্রিকা কমিটি এবং যারা পত্রিকা কম্পোজিং, প্রচ্ছদ অঙ্কন এবং মুদ্রণে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সহ সকলকে আন্তরিক ধণ্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পরিশেষে, নীহারিকা আগামী দিনে তার প্রকাশ সফলগতিতে অব্যাহত রাখুক - এই প্রার্থনা করি।

ডঃ নুরুল হক

অধ্যক্ষ

আল আমীন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজ

১১ ই জানুয়ারী, ২০২৪

বারুইপুর

আল আমীন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা

অধ্যাপক আলহাজ্ব রওশন আলী সাহেবের স্মরণে

অধ্যাপক মাতিন আহমেদ, ইংরেজি বিভাগ

আল আমীন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং শিক্ষা ভাবনার স্মারক এই 'নীহারিকা' পত্রিকাতে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আলহাজ্ব রওশন আলী সাহেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এবং তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে তাঁর সম্পর্কে কিছু লেখার এ এক ক্ষুদ্র প্রয়াস। ভারতীয় সংবিধানের ৩০ নম্বর ধারায় প্রদত্ত সংখ্যালঘুদের শিক্ষার মৌলিক অধিকারের বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে 'মাইনরিটি' কলেজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন এবং সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে অধ্যাপক রওশন আলী সাহেব যে ইতিহাস রচনা করে গেছেন, তা সত্যি এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এহেন এক ইতিহাস নির্মাণ সম্ভব হয়েছে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক রওশন আলি সাহেবের মূল্যবান অভিভাবকত্ব এবং তাঁরই সুযোগ্য পুত্র, আমাদের সকলের সম্মানীয়, আল আমীন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় ডক্টর নুরুল হক সাহেবের নেতৃত্বে, আত্মত্যাগ এবং অসামান্য অবদানের জন্য।

আদর্শ শিক্ষক, সমাজ সেবক, মানব দরদী, ধার্মিক এবং সর্বোপরি একজন ভালো মানুষ হিসাবে 'অধ্যাপক রওশন আলী সাহেব' কতটা অনুসরণযোগ্য, একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তা এই সংখ্যায় তুলে ধরার এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করেছি।

অধ্যাপক রওশন আলী সাহেবের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আল্লামা ইকবালের 'খুদী' (self) দর্শনটি আমার কাছে খুবই প্রাসঙ্গিক একটি বিষয় বলে মনে হয়েছে । 'খুদী' হল এক বাস্তব সত্তা, 'খুদী' বা 'self' বলতে আল্লামা ইকবল ব্যক্তির আত্মসত্ত্বাকে নির্দেশ করেছেন । তাঁর মতে 'খুদী' দর্শন তিন পর্যায়ে বিন্যস্ত : ১) বিশ্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া, ২) পরম করুণাময় আল্লাহ কে জানা এবং ৩) নিজেকে জানা। প্রচলিত অর্থে 'খুদীর' স্বরূপ বিশ্লেষণ করা একপ্রকার অসম্ভব বলা চলে, তবে সংজ্ঞার মাধ্যমে 'রুহু' বা 'খুদির' প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। ইচ্ছা শক্তি এবং কর্মবিহীন মানব জীবন নিষ্প্রাণ ও বিবর্জিত। প্রচেষ্টা ও ইচ্ছার দিকে মানুষ যতই অগ্রসর হবে, জীবনযাত্রায় সে ততটুকু উন্নত হবে। ইচ্ছার ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণশীলতার ফলে 'খুদী' শক্তিশালী ব্যক্তিত্বে রূপ লাভ করে।

ব্যক্তিগত জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ উপেক্ষা করে, মানব কল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, প্রকৃত জীবন বোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া সমাজকে উচ্চ শিক্ষার আঙিনায় ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক রওশন আলী সাহেব পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুসলিম মাইনরিটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন । এক শক্তিশালী 'খুদী' বা 'self' বা 'নফস' এর অধিকারী না হলে বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে জনগণের কল্যাণের জন্য এহেন এক কাজ এক প্রকার অসম্ভব বলা চলে।

১৯৩৪ সালের ১০ই অক্টোবর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মথুরাপুর থানার অন্তর্গত রানাঘাটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন অধ্যাপক রওশন আলী সাহেব। তিনি বাল্যকাল থেকেই একজন মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত ছিলেন। সমাজ সেবার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল শুরু থেকেই। মানুষের জন্য কাজ করতে ভালোবাসতেন। তিনি পেশায় ছিলেন একজন অধ্যাপক। দক্ষিণ বারাসাত ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজের দর্শন শাস্ত্রের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে ১৯৯৪ সালে

এই বিদ্যালয় সরকার অনুমোদিত ও সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কলেজে অধ্যাপনার পাশাপাশি বহড়ু হাইস্কুলে আংশিক সময়ের শিক্ষকতা করে উপার্জিত অর্থে নিজ প্রতিষ্ঠিত রানাঘাটা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন দিতেন। এছাড়া রানাঘাটা গ্রামে পোস্ট অফিস, দ্বীনি মাদ্রাসা স্থাপন ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। ১৯৮৮ সাল থেকে চাকরির সুবিধার্থে তিনি বারুইপুর শাজাহান রোডে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বারুইপুরে থাকাকালীন তিনি ভারতীয় সংবিধানের ৩০ নম্বর ধারা অনুসারে সংখ্যালঘুদের জন্য বারুইপুর যোগীবটতলায় আল আমীন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন যা ২০০৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে এবং ২০১২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত কলেজের স্বীকৃতি পায়।

তাঁর শিক্ষাজীবন, কর্ম জীবন এবং সমাজ জীবন যেমন উজ্জ্বল, ব্যক্তিজীবনেও একজন সহজ, সরল, সৎ, নির্ভীক, আদর্শবাদী ও পরোপকারী মানুষ ছিলেন। গরিবদের তিনি বিশেষ ভালোবাসতেন। অত্যন্ত ভাল মনের একজন মানুষ ছিলেন । একজন ধর্মপ্রাণ ও ধার্মিক মানুষ ছিলেন। পবিত্র কুরআন ও দর্শন শাস্ত্রের পাশাপাশি হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মের উপর তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। পবিত্র কোরআনের খুব ভালো তাফসির করতে পারতেন। তাঁর সুমধুর কণ্ঠে হৃদয়গ্রাহী কোরআন তেলোয়াত করতে পারতেন।

এগুলির পাশাপাশি তিনি নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করতেন। বাংলা এবং ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর বেশ দখল ছিল। বাংলা এবং ইংরেজিতে নিয়মিত কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখতেন। নজরুল গীতি ভীষণ ভালোবাসতেন। এটি তাঁর আরও একটু প্রিয় বিষয় ছিল। ২০০৬ সালে 'বেদ বাইবেল ও কোরআনে একেশ্বরবাদ' নামক গবেষণাধর্মী ও তুলনামূলক বই রচনা করেন। 'পবিত্র কুরআনে আল্লাহর পরিচিতি' তাঁর একটি অসমাপ্ত গ্রন্থ যা রোগ ভোগের কারণে তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেননি। তিনি ২০১৪ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারি আমাদের সকলের কাছ থেকে চির বিদায় নিয়ে পরলোক গমন করেন।

যে কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরীর পেছনে কত দুঃখ-কষ্ট, লড়াই-সংগ্রাম, আত্মত্যাগ থাকে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে বা মানুষের জন্য কিছু করার মধ্যে যেমন আনন্দ থাকে, কষ্টও কম নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন (বিশ্বভারতী) স্থাপনের ইতিহাস লোমহর্ষক। কবিগুরুর কথায় : "এর (শান্তিনিকেতনের) পিছনে যে কি পরিশ্রম আছে তা তো জানো না, কি দুঃখের সেসব দিন গেছে। যখন ছোট বউর (মৃণালিনী দেবী) গহনা পর্যন্ত নিতে হয়েছে। চারিদিকে ঋণ বেড়ে চলেছে। ঘর থেকে খাইয়ে পরিয়ে ছেলে জোগাড় করেছি। কেউ ছেলে তো দেবেই না। গাড়ি ভাড়া করে অন্যকে বারণ করে আসবে। এইরকম সাহায্যই দেশবাসীর কাছ থেকে পেয়েছি।.... ছোট বউকেও অনেক ভার সইতে হয়েছে, জানি সে কথা তিনি মনে করতেন না"।

সুতরাং, অনেক লড়াই-সংগ্রাম, দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে অধ্যাপক রওশন আলী সাহেব আল আমীন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে ইতিহাস রচনা করেন, তা যেন কালের গহবরে হারিয়ে না যায়। এবং যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন, তাঁর সেই আদর্শকে পাথেয় করে এই কলেজকে দেশের একটি অন্যতম ও আদর্শ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য সকলের আন্তরিক সাহায্য প্রার্থনা করি। শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া সমাজকে উচ্চশিক্ষায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এবং সর্বোপরি শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে অধ্যাপক রওশন আলী সাহেবের এই অনস্বীকার্য অবদানের জন্য পরম করুনাময় আল্লাহতালা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন, এই প্রার্থনা করি ।।

মনীষী প্রফুল্ল চন্দ্র রায় স্মরণে

অধ্যাপক দীপঙ্কর মান্না, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঊনবিংশ শতাব্দীর সে এক আশ্চর্য সময়। ১৮৬০ এর দশক যেন রত্নগর্ভা। নইলে মাত্র ১০ বছরের মধ্যে এতগুলি বরন্য সন্তান প্রসব। রবীন্দ্রনাথকে এক নম্বরে রেখে আরো কত মহা বিজ্ঞানী মহাজন জন্মেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপৎ রায়, মদনমোহন মালব্য, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এবং প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। এঁরা সবাই জন্মেছিলেন এই একটি দশকে। ভারত দেশটির মধ্যে এ কি বিপুল প্রাপ্তি। স্বল্পকালের মধ্যে এতগুলো ক্ষণজন্মার আবির্ভাব। জ্যোতিষীদের চর্চার বিষয় হতে পারে।

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ২রা আগস্ট অবিভক্ত বাংলার যশোর জেলার বাড়ুলি গ্রামে রায় পরিবারে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল এক শিশু। বাবা হরিশচন্দ্র এবং মা ভুবন মোহিনীর আদরের ফনু। বাংলার এই সন্তান পরে ভারতবাসীর 'আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র' কলিকাতার অ্যালবার্ট স্কুল থেকে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে এন্ট্রান্স পাশ করে মেট্রোপলিটন ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েন। বি.এ পরীক্ষার আগে গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে বিলাত যান। সেখানে প্রথমে বি এস সি পাস করেন এবং ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে রসায়ন শাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিএসসি ডিগ্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হোপ পুরস্কার পান। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরেন। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিজ্ঞানে সহকারী অধ্যাপক এবং ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে প্রধান অধ্যাপক হন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ওই পদ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজের রসায়ন বিভাগে 'পালিত অধ্যাপক' হন এবং ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ওই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

অমর কীর্তির অভিলাষ যে কোনও বিজ্ঞানীর থাকে। প্রফুল্ল চন্দ্রেরও ছিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে সব মৌলিক পদার্থ দিয়ে গড়া, তাদের একটা তালিকা বানিয়ে রসায়নের জগতে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন রুশ বিজ্ঞানী দ্রিমিত্রি মেন্ডেলিফ। কিন্তু সেই তালিকা তখনও সম্পূর্ণ নয়। তাতে ছিল কিছু ফাঁকফোকর। অর্থাৎ সবাই জানতেন, প্রকৃতিতে নিশ্চয়ই আছে এমন কোন মৌল, যাদের খোঁজ মেন্ডেলিফ পায়নি। প্রফুল্ল চন্দ্রের লক্ষ্য ছিল এমনই কিছু মৌল আবিষ্কার করে রসায়নের জগতে অমর হওয়া। সে জন্য ভারতীয় ভূতাত্তিকদের কাছ থেকে দুষ্প্রাপ্য খনিজ সংগ্রহ করে সেসব বিশ্লেষণ করছিলেন তিনি। এ ব্যাপারে প্রফুল্ল চন্দ্র প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরিতে ক্যালোমেল নামে এক রাসায়নিক তৈরির চেষ্টা করেছিলেন। ক্যালোমেল হল মারকিউরাস ক্লোরাইড। তা প্রস্তুতিতে প্রয়োজন মারকিউরাস নাইট্রেট নামে একটি পদার্থ। তো সেটা আগে বানাতে হবে।

সেই উদ্দেশ্যে প্রফুল্লচন্দ্র পারদের সঙ্গে লঘু নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটালেন। কিন্তু কি আশ্চর্য মারকিউরাস নাইট্রেট এর বদলে তৈরি হল মারকিউরাস নাইট্রাইট। মারকিউরাস জিনিসটা অস্থায়ী। অস্থায়ী আবার নাইট্রাইটও। ফলে এমন দুটো অস্থায়ী জিনিস একত্রিত হয়ে যে একটা স্থায়ী যৌগ তৈরি হতে পারি, এমন বিশ্বাস করতেন না গবেষকরা। প্রফুল্লচন্দ্র প্রমাণ করলেন তাঁদের ধারণা ভ্রান্ত। কলকাতায় বসে তাঁর এই সাফল্যের খবর রটে গেল সারা বিশ্বে। মারকিউরাস নাইট্রাইট এমনই বিচিত্র এক যৌগ যে, এর গঠনাকৃতি ঠিক কি হতে পারে তা নিয়ে গবেষণা এখনও চলছে।

ওই পদার্থটি ছাড়াও আরও যে সব শ্রেণীর যৌগ তৈরীর লক্ষে প্রফুল্লচন্দ্র সফল হন। সেগুলি হল, অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট, অ্যালকাইল অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট, সালফার ঘটিত জৈব পদার্থ এবং প্লাটিনাম ইরিডিয়াম কিংবা সোনা সংবলিত জৈব রাসায়নিক। নতুন পদার্থের সংশ্লেষণ ছাড়া ঘি, মাখন, তেলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ নিয়ে

ল্যাবরেটরির বাইরে প্রফুল্লচন্দ্র এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। বাংলার রেনেসাঁ যুগের উপহার। সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রফুল্লচন্দ্রের চরিত্রের সবচেয়ে বড় দিক। গিলক্রইস্ট বৃত্তি পেয়ে তিনি যখন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএসসি ছাত্র। তখন পরীক্ষার প্রস্তুতির মাঝখানে যোগ দিলেন এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায়। প্রবন্ধের বিষয় 'ইন্ডিয়া বিফোর অ্যান্ড আফটার দ্য মিউটিনি'। উচ্চ প্রশংসিত হলেও পুরস্কার পেল না তাঁর রচনা। না পাক 'বিষাদ মিশ্রিত আনন্দ' এর সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে বিলি করলেন সেই প্রবন্ধ। শিরোনাম 'এসে অন ইন্ডিয়া' উপজীব্য ব্রিটিশ শাসকের প্রতি সতর্কবাণী। সময় থাকতে অত্যাচারী শাসননীতি পাল্টাও নইলে বিপদ আছে। বৃটেনের মান্যগন্যদের উদ্দেশ্যে পাঠানো সেই পুস্তিকায় রীতিমত প্রতিক্রিয়া। সংবাদপত্রের হেডলাইনে উঠে এলেন এক তরুণ ভারতীয় ছাত্র।

১৮৮৮ সালের আগস্ট মাসে এডিনবরা থেকে রসায়নে ডক্টরেট হয়ে ভারতে ফিরলেন। অধ্যাপনা শুরু করেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা ও গবেষণা, পরে রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে যুক্ত হন। প্রফুল্লচন্দ্র থেকে উঠলেন সত্যিকারের আচার্য। ছাত্র বৎসল শিক্ষক। তাঁর স্নেহ স্পর্শে গড়ে উঠলো রসায়নে এক দল কৃতি গবেষক। ১৯৩২ সালে তাঁর ৭০ বছর বয়স পূর্ণ হলে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দন বার্তায় তুলে ধরলেন প্রফুল্লচন্দ্রের এই কৃতিত্ব। লিখলেন, 'উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক, তিনি বললেন, আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টি ও সেই ইচ্ছার নিয়মে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন। নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণ ভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনো সম্ভবপর হতো না। চিত্তের মধ্যে বৃত্তেও – সমান অকৃপণ এই অকৃতদার অধ্যাপক। নিজের রোজগার বিলিয়ে দিয়ে যাপন করেছেন ঋষির জীবন। এতে মুগ্ধ স্বয়ং গান্ধীজিও বললেন, 'সাধারন ভারতীয় বেশভূষা এবং হাব ভাবের এই মানুষটি যে একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী এবং অধ্যাপক তা মানতে কষ্ট হয়'।

প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদানের পর তিন বছরের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র শিল্পোদ্যোগীর ভূমিকায়। প্রতিষ্ঠা করলেন বেঙ্গল কেমিক্যাল। বিজ্ঞানীর কথায় ইউরোপে শিল্প ও বিজ্ঞান পাশাপাশি চলেছে। উভয়েরই একই সঙ্গে উন্নতি করেছে। একে অপরকে সাহায্য করিয়েছে। এই ব্যবস্থার মাঝখানে প্রফুল্লচন্দ্র নামলেন নতুন কাজে। জীবনের গুরুত্ব পূর্ণ সময়ে এমন এক গবেষণায় ডুপ দিলেন তিনি দীর্ঘ ১২ বছর ধরে চলল, তাঁর ইতিহাস চর্চা, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় জ্যোতির্বিদ্যা, পাটিগণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি ও চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চার খবর নানাভাবে আলোচিত। কিন্তু রসায়ন গবেষণায় চরক, সুশ্রুত, ভগভট্ট, বৃন্দ, চক্রবানি কিংবা নাগার্জুন যে দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে গেছেন, সেসব প্রায় সকলের অজানা। বিভিন্ন আকর গ্রন্থ মন্থন করে প্রফুল্লচন্দ্র দুই খন্ডে লিখলেন 'ম্যাগনাম ওপাস'। 'হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি'। প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হল যথাক্রমে ১৯০২ এবং ১৯০৮ সালে।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে মিউনিখ শহরের ডয়টসে ও ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটি তাঁকে সম্মানিত সভ্য রূপে নির্বাচিত করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শিক্ষার উন্নতি কল্পে তিনি প্রায় দু লক্ষ টাকা দান করেন। এছাড়া দরিদ্র ছাত্রদের প্রচুর অর্থ দান করতেন। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তাঁর কার্য উল্লেখ যোগ্য। দেশবাসী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তাঁকে আচার্য উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

ভারতে রসায়ন চর্চার উন্নতিতে প্রফুল্লচন্দ্রের আসল অবদান যতটা নয়, তার চেয়ে ঢের বেশি তরুণ প্রজন্মকে প্রেরণা ও হাতে খড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে। প্রফুল্লচন্দ্র নিজে বলেছিলেন, 'যা পেয়েছি তা বিরাট বড় সাফল্য বলে মনে হয়নি,তবে কাজ করে গেছি, আর তার মধ্যেই পেয়েছি সুখ'।

১৬ই জুন ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ৮৩ বছর বয়সে এই মনীষীর মহাপ্রয়াণ ঘটে।।

'তোমার কীর্তির চেয়ে, তুমি হে মহৎ'

(মরহুম আলহাজ্ব রওশন আলী স্মরণে)

অধ্যাপিকা শায়েরা বেগম, বাংলা বিভাগ

জীবন পরিপূর্ণতা পায় জীবনের মাহাত্ম্যে। মানুষের মহান কীর্তিই তাঁকে বাঁচিয়ে আমাদের মধ্যে। সেই মহান মানুষের সান্নিধ্য পাওয়া যায় জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণে। তাঁদের সান্নিধ্য জীবনকে শেখায় আদর্শ, মূল্যবোধ ও সার্থকতা। আমার অভিজ্ঞতায় তেমনই একজন মহান মানুষ মরহুম্ আলহাজ্ব রওশন আলি হালদার মহাশয়।

আলহাজ্ব রওশন আলী মহাশয় ছিলেন একাধারে আমাদের কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, অন্যদিকে সমাজদরদী, অধ্যাপক, লেখক ও বন্ধু। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠিন অধ্যাবসায় তাঁর জীবনের প্রতিটি কলস কানায় কানায় পূর্ণ করে রেখেছিল। আশ্চর্য ক্ষমাসুন্দর মনের অধিকারী হওয়ায় পরিবার-পরিজন-বন্ধুমহলে তাঁর পরিচয় ছিল মিশুকে মানুষরূপে।

ইসলামের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন এই বাস্তববাদী মানুষটি। ইসলামকে আদর্শ করে কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হতে পারতেন অবলীলায়। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আমি বলতে পারি কলেজের কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি ছিলেন শান্ত ও নির্লিপ্ত। তিনি কখনোই ধৈর্য হারাননি, পরিস্থিতিকে করেছেন শান্ত।

দর্শনের ছাত্র হওয়ায় তিনি ছিলেন উদার-মনোভাবাপন্ন। সমস্ত ধর্মের গুণী মানুষজন তাঁর কাছে ছিল আদরণীয়। একেশ্বরবাদ ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র । তিনি রচনা করেছেন 'বেদ, বাইবেল ও কোরআনে একেশ্বরবাদ'। বইটি পাঠক মহলে তাঁর প্রতিভাকে শীর্ষে পৌঁছে দেয়।

মানবদরদী ও সমাজদরদী এই মানুষটি নিজের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভুলে গিয়ে পিছিয়ে পড়া অনুন্নত মুসলমান সমাজকে শিক্ষার আলোকে টেনে আনতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেননি। তাঁর অদম্য উৎসাহ ও কর্মপ্রচেষ্টার ফল আজকের এই আল-আমীন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজ। তাঁর এই প্রতিষ্ঠানে কোনো বিশেষ ধর্ম নয়, মানুষ নয়, সমাজ নয়, তিনি আহ্বান করেছেন 'সুধীজন' ও 'গুণীজন'দের । তাদের আহ্বান করতে তিনি স্বরচিত গানে নিজ কণ্ঠে গেয়ে উঠেছেন-

'এসো সুধীজন, এসো গুণীজন।
এসো এসো স্বদেশের মহান প্রাণ।'

সর্বগুনে গুণান্বিত এই মানুষটির মধ্যে লুকিয়ে ছিল কবিসত্তা। তাঁর ডায়েরির পাতায় পাতায় রচিত হয়েছে অসংখ্য বাংলা ও ইংরেজি কবিতা। একজন চিন্তাশীল, আবেগপ্রবণ, রোমান্টিক মানুষের জীবনে বিচিত্র মুহূর্তের প্রকাশ ঘটেছিল এই সমস্ত কবিতায়। আমি তাঁর কবিতার পাঠক হয়েছিলাম কোনো কোনো দিনে। তাঁর এমনই একটি অপ্রকাশিত কবিতার লাইন তুলে ধরছি-

'জ্ঞানের সাধক জ্বালাও প্রদীপ

জীবনের প্রতি ভালোলাগাই তাকে জীবনানুরাগী করে তুলেছিল। তাইতো তিনি পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ-রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপলব্ধি করেছেন। জীবনের ক্যানভাসে এঁকে দিয়েছিলেন নানা রঙের ছবি। তাঁর জীবনের ক্যানভাসে পড়াশোনা, সাহিত্যচর্চা, ঈশ্বরতত্ত্ব, কবিতা, গানের পাশাপাশি ছিল গভীর শিক্ষানুরাগ। জীবনের শেষ পর্যায়েও ছিল অজানা বিষয়ের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ও পড়াশোনা। অটুট ছিল ভালোবাসা, তা জীবনের প্রতি ও মানুষের প্রতি। তাইতো তিনি যে কোনো শিক্ষক-অশিক্ষক ও ছাত্রের সমস্যাকে নিজের সমস্যা বলে মনে করে হাসি মুখে সমাধান করতেন।

সদাহাস্য আলাপী মানুষটি আবার কখনো কখনো ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন নিয়ম ভঙ্গের অপরাধে। কারণ কঠোর নিয়মানুবর্তিতাই মানুষকে সুশৃংখলিত করে। তাঁর জীবনের বহু অভিজ্ঞতা আমাকে শুনিয়েছিলেন, শিখেছিলাম মূল্যবোধ ও নিয়মানুবর্তিতা।

মরহুম আলহাজ্ব রওশন আলী মহাশয়ের শেষ জীবনের কয়েকটা বছরের স্বর্ণময় দিনগুলিতে আমি তাঁর সান্নিধ্যে থেকেছিলাম, হয়ে উঠেছিলাম খুব কাছের ও স্নেহের। তিনি প্রবীণ হলেও নবীনের মতামতকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে অনুভব করতেন। তাঁর সঙ্গে বসে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ঘন্টা'র পর ঘন্টা কেটে যেত, তাই তাঁর মৃত্যুর ১১ বছর পরেও তাঁর স্মৃতিকথা রোমন্থন করতে গিয়ে হৃদয় আজ ভারাক্রান্ত। পাশাপাশি আমি আজ আত্মশ্লাঘা অনুভব করছি তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছিলাম বলে, না হলে জীবনের অনেক কিছুই আজ অজানা থেকে যেত।

মানুষ মরণশীল, দৈহিকভাবে এই শরীর বিলীন হয়ে যায়। মহান মানুষের মৃত্যু কখনও হয় না। বলা যায়-

'নয়ন-সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই'।

আমাদের কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব রওশন আলী স্যারের স্বপ্নের আল-আমীন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজের সাফল্যই তাঁকে আমাদের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখবে । তাঁর জ্বেলে দেওয়া এই জ্ঞানের আলোকবর্তিতাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব আগামী ভবিষ্যতের দিকে, পূরণ করব তাঁর সমস্ত অঙ্গীকার ।।

সম্পর্কের সফলতা

সুমাইয়া খাতুন

ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, দ্বিতীয় সেমিস্টার

সম্পর্কের একটা আশ্চর্য রকমের রূপান্তর ক্ষমতা আছে। মানুষ একটা সম্পর্কে তখনই সফল ভাবতে শুরু করে, যখন সে সম্পর্কটা তাদেরকে একটা বৈধ আশ্রয়ে, একসাথে থাকবার, একসাথে হাঁটবার স্বীকৃতি দেয়।

অথচ কেবলমাত্র একসাথে থাকবার বৈধতা পেয়ে গেলেই কি একটা সম্পর্ককে সফল সম্পর্ক বলা যায়? আমি এমন অনেক মায়ার সম্পর্ক দেখেছি, টানের সম্পর্ক দেখেছি, অধিকারের, শ্রদ্ধা ও সম্মানের কিংবা ভালোবাসার সম্পর্ক দেখেছি, যেখানে একসময় মানুষ দুটো আর একসাথে থাকতে পারে না।

সম্পর্কের শুরুর দিকের সময়টা বেশ সুন্দর হয়। কত স্বপ্ন, কত সংসার, কত পরিকল্পনা ঘিরে থাকে চারিপাশে। দিব্যি সুন্দর সময় কাটে। এক সময় মনে হয়, এই মানুষটাকে ছাড়া আসলে আর চলবে না। নিজের একটা অস্তিত্ব হয়ে ওঠে। একটা অংশ হয়ে ওঠে। তারপর একদিন মতের বিরোধ শুরু হয়। চিন্তার ভিন্নতা জন্মায়। সম্পর্কের টানাপোড়েন চলে আসে। ঠিকঠাক বনিবনা হয় না। দুজন মানুষ আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়। কিম্বা একপক্ষ নিজেকে একটু একটু করে আড়াল করে ফেলে। যোগাযোগ কমে আসে ধীরে। মানুষটাকে ছাড়া থাকা যায় না। একটা সময় এই মানুষটার সাথেই আর থাকা যায় না। ব্যাপারটা সব সময় অনীহার না। কখনো কখনো সেল্ফ রেসপেক্ট টুকু বাঁচিয়ে রাখবার জন্যও আলাদা হতে হয়।

সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার ভেতর দুটো জিনিস থাকে। প্রথমটি মুক্তি, দ্বিতীয়টি ভাঙ্গন। যখন ভালোবাসা থাকার পরও আর একসাথে থাকবার আগ্রহ থাকে না, তখন সে সম্পর্ক থেকে বের হয়ে আসাতে একটা মুক্তি থাকে। ভাঙ্গনটাও কম থাকে না। নিজের ভেতর একটু একটু করে বড় হওয়া একটা সংসার ভাঙবার বেদনা একেবারেই কম না।

একটা সম্পর্ক ভাঙার কথা শুনলে আমি ভাবি কতটা অভিযোগ, অভিমান, অবহেলা, আগ্রহ, শূন্যতা নিয়ে মানুষ দুটো দূরে সরে গেল। তার চেয়েও বেশি ভাবি কতগুলো স্বপ্ন ও সংসারের মৃত্যু হয়েছে অসময়ে। তাদের একসাথে এক ছাদের নিচে একটা আস্ত জীবন কাটিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। অথচ দুজনের ছাদ আলাদা। দুজনের ঘর আলাদা। দুজনের ক্লান্তি দূরীকরণ আশ্রয়ের বুক আলাদা। দুজনের জীবন আজকাল দুভাবে চলে। কেউ জানে না কারো ঠিকানা, রোড, লেন, ব্লক কিংবা হাউস নাম্বার।

দুটো কোমল হাত, আঙ্গুলের ফাঁকে আঙ্গুল রেখে একসাথে সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও একসাথে থাকতে পারে না। কোন একদিন হুট করে পথে দেখা হয়ে গেলেও, পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার আগে। ভাঙ্গনটা নয়, স্পর্শ করা যায় না। স্পর্শের অধিকারটা আর থাকে না ।।

কালের পথে

অধ্যাপক দিলীপ কুমার হালদার, বাংলা বিভাগ

এই সভ্যতার রথ মানুষের ইতিহাসের বহু যুগ আগে-
আকাশ-পৃথিবী-জল, গিরি-মরু-অরন্যের বুক বয়ে গেছে।
নিস্তব্ধ নিঝুম রাত অতল সমুদ্রের ঢেউ আগুনের স্রোত-
কল্পনার বদ্ধ গুহা প্রবৃত্তির অনবদ্য আদিম রক্তের
কালো গাঢ়তার থেকে সে তরুণ তারুণ্যের তেজে উঠলো জ্বলে।
সভ্য সমাজের মন সফলতার শিখরে পৌঁছেছে অবাধে,
গ্রামের নগরায়ণ শিল্পের শিল্পায়নের প্রশস্ত পথের-
বাঁকে এলো বিশ্বায়ন, সরল জীবন পাত্রে ভরালো গরল।
শ্মশান উদ্বাস্তু মনে, মৃত শরীরের হাঁসি বধিরতা আনে,
রক্ত হাড় অশ্রু ঘাম জমেছে মাটির বুকে হলুদ সন্ধ্যায়।
দিক ভ্রান্ত পেচকের ডাকে কাঁপে না হৃদয় বাদামী কাকের,
তবু উষ্ণ পৃথিবীর শুষ্ক কঠিন জঠরে পোড়া কাঠ হয়ে
আগামী কালের পথে কালো হীরের পাথরে জীবাশ্মের রূপে

অবলুপ্তি

মাসুদা খাতুন
চতুর্থ সেমিস্টার

হারিয়ে গেছে কত জিনিস এই পৃথিবীর বুকে
বারে বারে মনে পড়ে যায় সেই হারিয়ে যাওয়াটাকে।

হারিয়ে গেছে মাথার উপর সবুজেরই ছায়া
হারিয়ে গেছে মুক্ত বাতাস, মুক্ত জীবন পাওয়া।
হারিয়ে গেছে কত পশু আর পাখির দল
যুগের সাথে পরিবর্তনই হচ্ছে এদের কাল।

হারিয়ে গেছে কত গ্রাম চষা মাটির গন্ধ
হয়েছে যেথায় শহরতলী কোলাহল আর দ্বন্দ্ব।
হারিয়ে গেছে যাত্রাপালা, লুপ্তপ্রায় বাউল গান,
হচ্ছে সেথায় নিত্য নতুন সিনেমা আর মডার্ন সং।

প্রকৃতি

নাজিবুর গাজী
বাংলা বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার

ভোর হয় পাখির ডাকে ঘুম ভাঙ্গে
সূর্যোদয়ের সাথে চাষিরা যায় মাঠে
বধূরা যায় ঘাটে, মাঠে ফসল কাটে।
সবুজে সবুজে ভরা প্রকৃতির কোল
বসন্তের কোকিলের গান
প্রকৃতির দৃশ্য দেখে আনমনা প্রাণ
মৃদুমন্দ বাতাসে প্রকৃতির ঘ্রাণ
ভালোবাসি মুক্ত এই প্রকৃতিকে
বারংবার ছাপ রেখে যাক বুকে।।

আমার কলেজ

রুবিনা খাতুন
দর্শন বিভাগ, (অনার্স) ষষ্ঠ সেমিস্টার

কোন কলেজের ছাত্রী আমি আপনারা কি জানেন ?
আল-আমীন মেমোরিয়াল মাইনোরিটি কলেজ সবাই সেটি চেনেন।
ক্লাসরুম, বেঞ্চ-টেবিল, পানীয় জল আর টয়লেট
পড়াশোনা, নিয়মকানুন সবকিছুতেই পারফেক্ট ।
ছাত্র-ছাত্রীরা সমস্ত ক্লাস মনোযোগ সহকারে করে
পাশ দিয়ে কেউ গেলেও তারা তাকায় না যে ফিরে।
আমাদের সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকা পরম শ্রদ্ধেয় জানেন?
সুযোগ পেলে, সময় হলে এসে দেখে যাবেন।
কলেজের অধ্যক্ষ যিনি, ড. নুরুল হক মহাশয়
ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি সর্বদা তিনি মহান করুণাময় ।
বাংলা বিভাগের অধ্যাপক যিনি আব্দুল আলী খান
পড়াশোনার ধরন শুনলে জুড়িয়ে যায় প্রাণ ।
আরও একজন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আছে জানেন?
ব্যবহারিক বাংলার ছন্দ গুলি খুব সুন্দর বোঝাতে পারেন ।
আর কেউ নন তিনি হলেন দিলীপ কুমার হালদার
ছন্দ সকল উচ্চারণ করে পড়ান তিনি চমৎকার ।
এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা
প্রতিটি কাজে সহায়তা করেন ছেড়ে দেন না একা ।
এবার বলি কথা আমার বিষয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকার
তাঁরা হলেন দর্শন বিভাগীয় সঞ্চারী ঘোষ ও গোলাম রসুল হালদার ।
দর্শনের সকল পাঠ্য বিষয় পড়ান তাঁরা যত্ন সহকারে
সে সব বিষয় না বুঝে আর কে থাকতে পারে !
শেখানো সব বিষয়ের উপর নেওয়া হয় ক্লাস টেস্ট
তাই তো বলি আমার কলেজ সব চাইতে বেস্ট ।
এসব কিছু আপনারা যদি সত্যি দেখতে চান
তাহলে অনুরোধ একটি বার আমার কলেজ ঘুরে যান।

সিরাজউদ্দৌলা

অধ্যাপক গোবিন্দ মন্ডল

ইতিহাস বিভাগ

নবাব সিরাজউদ্দৌলা বা মির্জা মোহাম্মদ সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব। সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন আলীবর্দী খানের নাতি, জৈনুদ্দিন আহমেদ খান ও আমিনা বেগমের পুত্র। তিনি **১৭৩৩** খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন।

সিরাজ তার দাদুর কাছে ছিল খুবই আদরের। যেহেতু তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। **১৭৪৬** সালে আলীবর্দী খান মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গেলে সিরাজ তাঁর সঙ্গী হন। আলীবর্দী সিরাজউদ্দৌলাকে বালক বয়সেই পার্টনার শাসন কর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর অল্প বয়স ছিল বলে রাজা জানকি রাম কে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু বিষয়টি সিরাজকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাই উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এই ঘটনার সংবাদ পেয়ে আলীবর্দী খাঁ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন। সেই দিনই আলীবর্দী খাঁ ঘোষণা করেন, আমার পরে সিরাজউদ্দৌলাই বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মসনদে আরোহন করবে।

তবে সিরাজকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করার ঘটনা তার আত্মীয়-বর্গের অনেকেই মেনে নিতে পারেনি। অনেকেই তার বিরোধিতা শুরু করে। এর মধ্যে ছিলেন ঘেসেটি বেগম এবং তার স্বামী নোয়াজেশ মোহাম্মদ। অতঃপর এই রকম পরিস্থিতিতে **১৭৫৬** সালে **১০ই** এপ্রিল শাহকুলি খাঁন মির্জা মোহাম্মদ হায়বৎ জংবাহাদুর (সিরাজউদ্দৌলা) বাংলা বিহার উড়িষ্যার সিংহাসনে বসেন।

সিরাজউদ্দৌলা যখন সিংহাসনে আরোহন করেন, তখন থেকেই ইংরেজদের প্রতাপ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। তিনি তাদের দমন করার জন্য কাশিমবাজারের কুটিয়াল ওয়াটসনকে কলকাতার দুর্গা প্রাচীর ভেঙে ফেলতে এবং ভবিষ্যতে নবাবের অনুমতি ছাড়া এ ধরনের কাজ না করার নির্দেশ দেন। কিন্তু সিরাজের আদেশ অমান্য করে তারা কাজ বহাল রাখে। তিনি মতিঝিল প্রাসাদ অধিকার করে ঘসেটি বেগমকে মুর্শিদাবাদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। মতিঝিল অধিকার করে নবাব কাশিম বাজারের উদ্দেশ্যএ রওনা হন। ২৭শে মে সিরাজের সেনাবাহিনী কাশিমবাজার দুর্গ অবরোধ করে।

একই বছর **১৮ই** জুন সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করেন। তুমুল যুদ্ধ হওয়ার পর ২০ জুন কলকাতা দুর্গে প্রবেশ করে এবং উমিচাঁদ, কৃষ্ণবল্লভকে দরবারে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর সেনাপতি মানিক চাঁদের হাতে দুর্গের শাসনভার ছেড়ে দিয়ে সিরাজ রাজধানীতে ফিরে আসে। দিল্লির বাদশা পূর্নিয়ার নবাব শওকত জং কে বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাবী সনদ পাঠালেন। শওকত জং সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করেন। ইংরেজরা এই সংবাদ পেয়ে গোপনে শওকত জং এর সাথে মিত্রতা করার চেষ্টা করেন। এদিকে ইংরেজ দরবার রবার্ট ক্লাইভ কে প্রধান সেনাপতি করে কলকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য পাঠায়। সিরাজ শওকত জংকে প্রতিরোধ করার জন্য রওনা

ক্লাইভ ও ওয়াটসন বিনা যুদ্ধে তারা কলকাতা দূর্গ জয় করে নেন। এর আগে ক্লাইভ ও ওয়াটসন কলকাতায় এসে সিরাজউদ্দৌলার কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। সিরাজ তা প্রত্যাখ্যান করেন। সিরাজ তাঁর মন্ত্রীদের কুচক্রের বিষয়ে শঙ্কিত হয়ে ইংরেজদের সকল দাবি মেনে নিয়ে ১৭৫৭ সালে ৭ই ফেব্রুয়ারি ইংরেজদের সাথে আলিনগরের সন্ধি স্বাক্ষর করেন।

২৩ শে জুন সকাল থেকেই পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজরা মুখোমুখি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হল ।ইংরেজরা 'লক্ষবাগ' নামক আমবাগানে 'সৈন্য সমাবেশ' করল। বেলা আটটার সময় হঠাৎ করেই মীর মদন ইংরেজ বাহিনীকে আক্রমণ করেন। তার প্রবল আক্রমণে টিকতে না পেরে ক্লাইভ তার সেনাবাহিনী নিয়ে আম বাগানে আশ্রয় নেয়। মীর মদন ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু মীরজাফর ইয়ার লতিফ, রায় দুর্লভ যেখানে সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাদের সামান্যতম সাহায্য পেলে হয়তো মীর মদন ইংরেজদের পরাজয় করতে বাধ্য করতে পারতেন। দুপুরের দিকে হঠাৎ বৃষ্টি নামল। সিরাজউদ্দৌলার গোলাবারুদ ভিজে যায়। তবুও মীর মদন ইংরেজদের সাথে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই গোলার আঘাতে মীরমদন মৃত্যুবরণ করেন।

মীর মদনের পতনের পরেও অন্যতম সেনাপতি মোহনলাল যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি যুদ্ধ বিরতির বিরুদ্ধে গিয়ে ইংরেজ বাহিনীকে আক্রমণের পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু মীর জাফর বিশ্বাসঘাতকতা করে তার সৈন্যবাহিনীকে শিবিরে ফেরার নির্দেশ দেন। এই সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা নবাব কে আক্রমণ করে। যুদ্ধ বিকেল পাঁচটায় শেষ হয় এবং নবাবের ছাউনি ইংরেজদের অধিকারে আসে। তখন কোন উপায় না দেখে সিরাজ রাজধানী রক্ষা করার জন্য দুই হাজার সৈন্য নিয়ে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেন কিন্তু রাজধানী রক্ষার জন্য কেউ তাকে সাহায্য করেনি। সিরাজ তার সহধর্মিনী লুৎফুন্নেসা ও ভৃত্য গোলাম হোসেনকে নিয়ে রাজধানী থেকে বের হয়ে স্থলপথে ভগবান গোলায় পৌঁছে যান এবং সেখান থেকে নৌকা যোগে উত্তর দিকে যাত্রা করেন। তার আশা ছিল পশ্চিমাঞ্চলে পৌঁছতে পারলে ফরাসি সৈনিক মসিয়ে নাসের সহায়তায় পাটনা পর্যন্ত গিয়ে রামনারায়ণের কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে ফরাসি বাহিনীর সহায়তায় বাংলাকে রক্ষা করবেন।

মীরজাফর রাজধানীতে পৌঁছে নবাবকে খুঁজে না পেয়ে চারিদিকে লোক পাঠালেন ১৭৫৭ সালের ৩রা জুলাই সিরাজউদ্দৌলা মহানন্দ নদীর স্রোত অতিক্রম করে এলেও তাতে জোয়ার ভাটার ফলে হঠাৎ করে জল কমে যাওয়ায় নাজিমপুরের মোহনায় তার নৌকো চড়ায় আটকে যায়। তিনি নৌকা থেকে নেমে খাবার সংগ্রহের জন্য একটি মসজিদের নিকটবর্তী বাজারে আসেন। সেখানে কিছু লোক তাকে চিনে ফেলে অর্থের লোভে মীর জাফরের সৈন্যবাহিনীকে খবর দেয়।

এ সম্পর্কে ভিন্ন একটি মত আছে। এক ফকির এখানে নবাব কে চিনে ফেলে। ওই ফকির আগে নবাবের কাছে শাস্তি প্রাপ্ত হয়ে তার এক কান হারিয়েছিলেন। সেই ফকির নবাবের খবর জানিয়ে দেয়। তারা এসে সিরাজকে বন্দী করে মুর্শিদাবাদ পাঠিয়ে দেয় পরের দিন। ৪ই জুলাই মীরজাফরের আদেশে তার পুত্র মিরনের তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদিবেগ নামের একঘাতক সিরাজকে হত্যা করে।

কথিত আছে সিরাজের মৃত্যুর পর তার মৃতদেহ হাতির পিঠে চড়িয়ে সারা শহর ঘোরানো হয়। মুর্শিদাবাদে

মৃত্যু

শেখ মেহেবুব আলী

ইংরেজি অনার্স, ষষ্ঠ সেমিস্টার

মৃত্যুর সভ্যতা মানবজাতির কাছে সুনিশ্চিত
মৃত্যুর নির্ধারিত সময় সবার কাছে অনিশ্চিত ।
মৃত্যুকে কেউ কখনো এড়াতে পারে না
মৃত্যুকে পছন্দ অপছন্দ যাই করো, রক্ষা পাবে না ।

কতক্ষণ বেঁচে থাকবে, নেই কোন নিশ্চয়তা
হায়াতের ব্যাপারে জানেন, একমাত্র বিধাতা ।
সুস্থ মানুষ হঠাৎ করে মারা যায়
অসুস্থ মানুষ যুগে যুগে থাকে মৃত্যুর অপেক্ষায় ।

যার বেঁচে থাকাতে সবাই খুশি, সে যায় মরে
যার মৃত্যুতে সবাই খুশি, সে থাকে বেঁচে ।
ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেও শিশু মারা যায়
প্রতিবন্ধী, পাগল ও দীর্ঘায়ু পায় ।

মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে প্রস্তুতি থাকা চাই
মরণের পরেও যাতে সুখী হওয়া যায় ।
নেক্কার হিসেবে জীবন যেন শেষ হয়

তবেই তুমি

মুহসিনা শেখ
দ্বিতীয় সেমিস্টার বাংলা অনার্স

আমার নীরবতার ভাষা যদি
নাই বুঝতে পারো
তবে তুমি আমার নও
হও অন্য কারো ।

যদি আমার দূরত্বেও
মনেতে না করিস বাস
তবে আমরা বহন করছি
মৃত সম্পর্কের লাশ ।

কতটা দিয়ে কতটা পেলাম
হিসেব করো যদি
তোমার থেকে আপন হোক
আকাশ পাহাড় নদী ।

এমন ভাবে আঁকড়ে ধরো না
কষ্ট হয় শ্বাসে

মোবাইল

তানিয়া সর্দার
চতুর্থ সেমিস্টার

তোমায় ছাড়া আজ চলে না পুরো বিশ্ব
তুমিই যে সব সমস্যার মূল রহস্য।

মোবাইল তুমি নিয়েছ কেড়ে শারীরিক সুস্থতা
মোবাইল তুমি দিয়েছো পড়াশোনার ব্যর্থতা।

মোবাইল তুমি নারীর লজ্জা নিয়েছ কেড়ে
আজ তোমার জন্য আত্মহত্যা গিয়েছে বেড়ে।

মোবাইল তুমি বাবা মায়ের প্রচুর বিরক্তি
মোবাইল তুমি নিয়েছ কেড়ে যুবক যুবতীর তৃপ্তি!

তোমার আগমনে জীবনের হয়েছে সর্বনাশ
মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা তোমারি দাস।

মোবাইল তুমি কমিয়েছো বন্ধুদের মেলামেশা
মোবাইল তুমি মানুষের এক ভয়ংকর নেশা!

স্বপ্ন

নামিরা খাতুন
চতুর্থ সেমিস্টার

মাতঙ্গিনী মিতালি কে বলল- মিতালি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে, লগনের বেশি বাকি নেই। ওদিক থেকে আবার ডাক পরল মাতঙ্গিনীর, মিতালির শ্বশুর বাড়ির লোকজন বেরিয়ে পড়েছে। তুই জামাই বরণের জন্য ডালাটা তৈরি কর। এত আনন্দের দিনেও মিতালীর চোখের সামনে সব কিছু যেন ঝাপসা, ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে নিজের ভাগ্যের কথা ভাবছে আর নিজেকে অসহায় মনে করছে।

আজ ১৫ই অগ্রহায়ণ, মিতালি ও সুবোধের বিয়ের দিন মিতালি বাড়ির বড় মেয়ে, তারপরে আছে আর একটা ভাই ও দুই বোন। মিতালির বাবা নরহরি দাস যে কারখানায় কাজ করে সেটি সুবোধের বাবা মতিলাল বাবুর। মিতালী খুব মেধাবী ছাত্রী। তার স্বপ্ন ছিল সে একজন ডাক্তার হবে। বাড়ির অবস্থা তেমন ভালো না থাকায় সে যেসব স্কলারশিপ পায় সেগুলো আর টিউশনি করে যেটুকু পায় সেগুলো জমাতে শুরু করে। এদিকে সুবোধের বাবা মতিলাল বাবু একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। মতিলাল বাবুর একমাত্র সন্তান সুবোধের মানসিক সমস্যা থাকাই সে বাড়ির এক কোণে পড়ে থাকে। সেখানেই তার খাওয়া দাওয়া সব হতো। সুবোধকে নিয়ে মতিলাল বাবু এবং তার স্ত্রী সুরবালা দেবী খুবই চিন্তিত থাকতো।

বাড়ির অবস্থা তেমন ভালো না থাকায় নরহরি দাস মতিলাল বাবুর থেকে প্রায় সময় টাকা ধার নিত। মিতালির ডাক্তারি কলেজে ভর্তি হওয়ার শেষ তারিখ ক্রমশ এগিয়ে আসছিল। মিতালির জমানো টাকা ছাড়াও কিছু টাকা কম পড়ছিল। আগের মত এবারেও নরহরি দাস মতিলাল বাবুর কাছ থেকে বাকি টাকা ধার করে এনে মেয়েকে দিল কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য।

সেদিন ছিল কলেজে ভর্তির শেষ তারিখ। নরহরি দাস মেয়েকে এগোতে গিয়েছিল তার সাথে। কিছুটা পথ যাওয়ার পর মিতালীর মনে পড়ল তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে মিতালী কিছু কাগজপত্র বাড়িতে ফেলে এসেছে। নরহরি দাস মিতালী কে বলল, মা, তুই এখানে অপেক্ষা কর, আমি বাড়ি গিয়ে নিয়ে আসছি। বাবার অপেক্ষায় সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে বিকেল হয়ে গেল কিন্তু নরহরি দাস এখনো পর্যন্ত এলো না। ততক্ষণে কলেজে ভর্তির সময়ও পার হয়ে গিয়েছে। রাগ, দুঃখ, আর একরাশ হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো মিতালী।

বাড়ির রাস্তায় ঢোকার মুখে লোকজনের ভিড় দেখে এবং কান্নার আওয়াজ শুনে মিতালী ভয়ে আঁতকে উঠলো। কয়েকজন তাকে জিজ্ঞাসা করল, কীরে মিতালী তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলিস। মিতালী তাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, বাড়িতে এত ভিড় কেন ? কিছু হয়েছে নাকি? কেউ কোন উত্তর দিল না শুধু বলল, তুই তাড়াতাড়ি বাড়িতে যা। বাড়ি এসে মিতালি দেখল তার বাবা আর নেই।

মিতালীকে রেখে নরহরি দাস যখন বাড়িতে এলো কাগজপত্র নিতে, এসে মাতঙ্গিনী কে বলল, মেয়েটা যখন বাড়ি থেকে বের হচ্ছিল সবকিছু গুছিয়ে দিতে পারোনা। মাতঙ্গিনী বলল আমি এইসব কাগজপত্র সম্পর্কে কিছু জানি নাকি যে ওকে সব গুছিয়ে দেব। ওর জিনিসপত্র ও গুছিয়ে নিয়ে যেতে পারেনা। এই নিয়ে নরহরি দাস ও মিতালীর মায়ের মধ্যে কিছুটা তর্ক হল। তারপর কাগজপত্র নিয়ে নরহরি দাস তাড়াহুড়ো করে রাস্তা পার হচ্ছিল তখন একটা লড়ি এসে তাকে ধাক্কা দেয় এবং সে ছিটকে অপরদিকে চলে যায় । তখনও নরহরি দাসের প্রাণ ছিল। আশেপাশে থেকে সব লোক ছুটে এলো, ভিড় করে দেখতে লাগলো। তখনও যদি কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে

ভেবে ওখানে থাকা সকলের কাছে হাতজোড় করে প্রার্থনা করল যে, তাদের মধ্যে কেউ একজন যেন তার হাতে থাকা কাগজগুলো নিয়ে তার মেয়েকে দিয়ে আসে। তার মেয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে। কাগজপত্র গুলো না দিয়ে এলে সে তার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে না। কিন্তু কেউ তার কথা শুনলো না, সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর নরহরি দাস ওখানেই মারা গেল। রাস্তায় ভিড় দেখে একটা লোক এগিয়ে এসে দেখে যে নরহরি দাস মৃত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে আছে। লোকটি ছিল তার সহকর্মী। সে তাকে বাড়িতে নিয়ে গেল। বাবার শরীরে রক্ত আর হাতে থাকা কাগজগুলো আর অল্প কিছু টাকা দেখে মিতালী ভয়ে কষ্টে কাঁপতে লাগলো। যেন তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ভাগ্যকে দোষ দেবে নাকি নিজেকে, সে বুঝতে পারল না।

যে কটা টাকা ছিল তা দিয়ে নরহরি দাসের শেষ কাজ করা হলো। মিতালীর বাবার মৃত্যুর পর তার মায়ের পক্ষে এত বড় সংসার চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। মিতালী টিউশনি করে যেটুকু রোজগার করতো তা ভাই-বোনদের পেছনে শেষ হয়ে যেত। কয়েক মাস যাওয়ার পর মতিলাল বাবুর এক চাকর এসে খবর দিল, যে টাকা নরহরি দাস ধার নিয়েছিল মতিলাল বাবু সুদ সমেত সে টাকা ফেরত চেয়েছে এক সপ্তাহের মধ্যে। টাকার পরিমান অনেক হওয়ায় মিতালী এবং মাতঙ্গিনী কি করবে কিছু বুঝতে পারল না। টাকা ফেরতের দিন সংখ্যা বাড়ানোর জন্য তারা দুজন গেল মতিলাল বাবুর সঙ্গে কথা বলতে। মাতঙ্গিনী মতিলালবাবু কে বলল- বাবু আর কয়েকদিন সময় দিন আমি আপনার সব টাকা শোধ করে দেব। কিন্তু মতিলালবাবু মাতঙ্গিনী কে বললেন- হয় এক সপ্তাহের মধ্যে সুদ সমেত টাকা ফেরত দিতে হবে, না হলে মিতালীর সঙ্গে আমার ছেলে সুবোধের বিয়ে দিতে হবে। এই বলে তাদেরকে ওখান থেকে চলে যেতে বলল।

বাড়ি এসে সারারাত মিতালীর ঘুম হয়নি। মিতালীর মা কখনোই চাননি সুবোধের সাথে মিতালীর বিয়ে হোক। যতই বাড়ির পরিস্থিতি খারাপ হোক না কেন। মেয়ের খারাপ কোন মা-ই চাইবে না। মাতঙ্গিনী মিতালীকে বলেছিল যতই কষ্ট হোক না কেন, না খেয়ে হলেও টাকা জমিয়ে মতিলাল বাবুকে ফেরত দেবে কিন্তু সুবোধের সঙ্গে মিতালির বিয়ে দিয়ে মেয়ের জীবন নষ্ট করবে না । কয়েকদিন ঠিকঠাক ভাবে খাওয়া দাওয়া না হওয়ার কারণে মিতালীর ভাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। মাতঙ্গিনী যতই লুকানোর চেষ্টা করুক মিতালীর চোখে বাড়ির পরিস্থিতি পরিষ্কার ভাবে নজরে পড়েছিল। মিতালী অনেক জায়গায় চেষ্টা করেছিল একটা চাকরি জন্য যাতে বাড়ির পরিস্থিতি সব ঠিক করা যায়। কিন্তু কোন দিকেই কোন ফল পাওয়া যায়নি। এবং আপন বলে তাদের কেউ ছিল না।

দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল, কিন্তু সব টাকা জোগাড় হলো না। অসহায় অবস্থায় আর কোন রাস্তা খুঁজে না পেয়ে মিতালির বিয়ের জন্য রাজি হয়ে গেল। এমন পরিস্থিতিতে লড়বার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে মাতঙ্গিনী।

আজ সেই বিয়ের দিন। তখনো ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে রয়েছে মিতালী। তখনই মিতালীর ঘরে ছুটকি এল, এসে বলল- দিদি তোমার একটা চিঠি এসেছে। মিতালী ছুটকিকে জিজ্ঞাসা করল, কে পাঠিয়েছে? ছুটকি বলল- আমি জানিনা দিদি কাকিমা বলল- তোমাকে দিতে। এই বলে ছুটকি চলে গেল। মিতালী চিঠিটা খুলে দেখলো একটা চাকরির নিয়োগ পত্র। আবার কিছুক্ষণ পর ছুটকি এসে মিতালীকে বলল, দিদি কাকিমা তোমাকে রেডি হতে বলল। তোমাকে নিতে লোক আসবে এখনই। মিতালী কী করবে বুঝতে পারল না। স্বপ্ন নাকি সংসার কোনটাকে বেছে নেবে মিতালী!!

পোড়ো চাঁদ

মুসলিমা খাতুন

ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, দ্বিতীয় সেমিস্টার

গান পয়েন্টে আমার মাথাকে নিশানায় রেখে
সভ্যতা আমায় বলেছিল এক ফালি চাঁদ এনে দিতে ।
আমি এনেছিলাম একটা আস্ত চাঁদ,
বনমালীর শখের বাগান থেকে ।
তার অ্যাসিডে ঝলসানো মুখ,
শরীরময় হিংস্র পশুর আঁচড় ।
কালচিটে পড়া ক্ষত চিহ্ন দেখে মনে হয়,
ইঁদুরে কুরে কুরে খেয়েছে চাঁদেরে !
নিরন্ন, খালি পেট আর পিঠ মিলে গেছে একই সমান্তরালে,
তবুও কামনার আবিলতায় বুক চিতিয়ে থাকতে হয় তার।
এর মাঝে প্রেম আসে গোপনে,
জানতো সেই অধিকার নেই ভালোবাসার, তবুও...
ভুল করেছিল ভালোবেসে !
ভুল করেছিল সভ্য হতে চেয়ে !

OUR SHADOWS

Sahin Jamadar
General, 3rd Semester

Once there was a museum situated in Kolkata.
The museum contained many rooms and different rooms depicting different eras.
At the back side of the museum, there was a small hall. The hall was made up of mirrors. The walls, roofs, and floors made up of mirrors.
One day the caretaker of the museum forgot to lock the back door of the museum which directly led to the mirror room.
A dog was roaming near the museum and by mistake entered the room.
When the dog was in the middle of the room, he saw his reflection and thought that a group of dogs surrounded him from all sides.
Seeing that the dog got scared and started to bark.
The dog could see all the reflections near barking at him back and due to the mirror his eco got back to him.
So, he was confused and didn’t know what to do.
He got frightened and started to bark again and again.
The next morning when the caretaker entered the museum, he saw that the back door was open.
So, he rushed to every room to see if something was stolen or not.
After searching all the rooms, the caretaker FELT relief that nothing was stolen.
At last, when he checked the mirror room, he saw the dead body of the dog in the middle of the room.
He examined the dog. And came to the conclusion that there was no harm to the dog but he died fighting his own reflection.
The Conclusion of the Caretaker was___
"In this world, our feelings, thought and action are all mirrors to us. if we are positive then everything that happens to us will be positive."

ফিরিয়ে দাও

অধ্যাপক আব্দুল আলী খান
বাংলা বিভাগ

ফিরিয়ে দাও আমার শৈশব
কেড়ে নেওয়া খেলার মাঠ
ফিরিয়ে দাও স্বচ্ছন্দ্যতা, স্বাভাবিকের আশ্বাস
ফিরিয়ে দাও ফোরজিতে ভেসে যাওয়া
জীবনের স্তর ।।

বাঁচতে দাও অকৃত্রিম মৌলিকতায়
বাঁচতে চাই সৃষ্টির প্রথম লগ্ন ধরে
আধুনিকের ব্যাক পাইপারস যাও সরে
বল, ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ান
লোভনীয় প্রলোভন ছেড়ে, বাঁচতে দাও
জীবনের স্বাভাবিক রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শ করে ।।

কবি সুকান্তের 'এ শিশুর বাস যোগ্য পৃথিবী'
হয়নি এখন। আগামীর জন্য
ফিরিয়ে দাও সবুজ মাঠ, ছুটির বিকেল
বন্ধুর হাত, মানবের ছোঁয়ায় ভরা অনুভব
তোমার লোভের পাক খাওয়া
ধমায়িত কল্পলিতে দিওনা ঢেঁকে

ইচ্ছে

সামিম জমাদার
দ্বিতীয় সেমিস্টার, ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ,

ইচ্ছে ডানায় ভর করে চল
দুজনে যাই উড়ে ।
নিয়ম-কানুন, শৃঙ্খলা আর
কোলাহল থেকে দূরে ।
সেথায় রবে দুজনার এক
ইচ্ছে নামক বাসা,
ইচ্ছে মতো থাকবো দুজন
থাকবে ভালোবাসা ।
ইচ্ছেরা সব স্বাধীন যেথায়
ইচ্ছে মেঘের মতো ।
দুঃখরা সব পড়বে ঝরে
বৃষ্টি ঝরার মতো ।
জোৎস্না রাতে ইচ্ছে মতো
মাখবো চাঁদের আলো ।
নির্জনতায় বসবো দুজন
ইচ্ছে মতো ভালো ।
আজকে চলো ডানা মেলি
ইচ্ছে আকাশ মাঝে ।
ভালোবাসার ভেলায় ভাসি

গ্রামের ছেলে ভোলা

আবু উবাইদা গাজী (আরবি অনার্স, দ্বিতীয় সেমিস্টার)

এক গ্রামে ভোলা নামের এক ছোট্ট ছেলে ছিল। ছেলেটি একটু ডানপিটে। পাড়ার আম গাছ, কাঁঠাল গাছে ঘুরে ঘুরে তার বেশির ভাগ দিন কাটতো। তার জ্বালায় পাড়ার কোন গাছে ফল পাকবার যো ছিল না, গন্ধ পেলেই সে ফল ভোলার পেটে চলে যেত। ভোলা ডানপিটে হলেও ও খুব বুদ্ধিমান। স্কুলে সে প্রায় প্রথম হত। তার ডান পিঠের একটু পরিচয় দেওয়া যাক।

ভোলার বাবা একজন কৃষক। তাই তাকে মাঝে মধ্যে মাঠে যেতে হতো। ভোলার বাবা ভোলাকে একদিন মাঠে পাঠায় তাদের চাষের জমি দেখতে। ভোলা মাঠে যায়। মাঠের পাশেই একটা মস্ত বড় অশ্বত্থ গাছ আছে। সেই গাছের পাতার আড়ালে তার এবং দুই বন্ধু জাহির ও আবিদের বসে থাকার মত তিনটে সুন্দর জায়গা করে রেখেছে। বাড়ি থেকে যাবার সময় মুড়ি আর বাদাম নিয়ে গিয়ে তারা গাছের উপর বসে বসে খায় আর গল্প করে। একদিন দুপুরে একজন লোক ক্লান্ত হয়ে গাছের নিচে বসে আছে। হঠাৎ তাদের মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি আসে, তারা ভাবে লোকটাকে একটু ভয় দেখানো যাক। যেই কথা সেই কাজ। ভোলা গাছের উপর থেকে বলে ওঠে - ' এঁাই বোঁ টাঁতুই আঁোোঁ র গাঁ ম র ছনমচ ভেঁমনাঁভবাঁছোঁছ ে?ওঠ বলছ এাঁমেঁন ভথাঁমেঁ আছে ভগাঁম োোঁ োঁুত ভতাঁ র ঘাঁ ড় ভোঁ টকামবা হাঁ হাঁ হাঁ"।

লোকটির মনের তখন শঙ্কিত অবস্থা। তার লোম খাড়া হয়ে যায়। সে তো বাবাগো মাগো গাছের উপর ভূত বলে দৌড়াতে থাকে। ভোলার বাবা তখন মাঠে আসছিল। লোকটির কথা শুনে তার বাবা বুঝে যায় যে এটা ভোলারই কাজ। তার বাবা গাছের নীচে এসে বলে ভোলা তুই নিচে নাম আগে। ভোলা তখন বুঝে যায় যে আজ তার আর নিস্তার নেই। ওর বাবা বলতে থাকে তোকে আমি ক্ষেত দেখার জন্য মাঠে পাঠিয়েছি আর তুই কিনা গাছে চড়ে লোককে ভয় দেখাচ্ছিস? নাম বলছি। ভোলা ভয়ে ভয়ে গাছ থেকে নেমে আসে ওর বন্ধুরাও নেমে আসে। ভোলার বাবা একটা লাঠি নিয়ে মারতে যাবে এমন সময় ভোলা ও তার বন্ধুরা দৌড় লাগায়। কিছু দূর যাবার পর তার মামা তাকে দেখতে পেয়ে বলে ওঠে কিরে ভোলা তুই এই দুপুর বেলায় কোথায় চললি দৌড়ে দৌড়ে? আমি তো তোদের বাড়ি যাচ্ছি তোকে নিয়ে যাব বলে। মামা হাইস্কুলের মাস্টার । ভোলারও প্রাইমারি শেষ। এবার হাইস্কুলে যাবে ভোলা। তাই ভোলাকে নিয়ে যাবে। মামা নিজের হাইস্কুলে ভর্তি করার জন্য। ভোলা বললো মামা বাবা মারবে ধরতে পারলে। মামা বললেন, নিশ্চয়ই তুই কিছু দুষ্টুমি করেছিস! কি করেছিস বল আমাকে? ভোলা তার মামাকে সব খুলে বললো। মামা সব শুনে হা হা হা করে হেসে উঠে বললেন, তোর দুষ্টুমি এখনো কমেনি? ঠিক আছে আমার সঙ্গে চল। কেউ তোকে মারবে না । এই বলে ভোলা কে নিয়ে ওদের বাড়ি গেল। ভোলার মা তো তার দাদাকে দেখে বেজায় খুশি। বলল দাদা হঠাৎ কি ব্যাপার? একটা খবর দিয়ে আসতে পারতে। যাক এসেছো যখন এক সপ্তাহের আগে যেতে দেব না। অনেকদিন পরে আমাদের বাড়ি এলে। মামা বললেন না রে স্কুল খুলবে আমি ভোলাকে নিয়ে যেতে এসেছি আমার স্কুলে ভর্তি করাবো। ও নাকি বুদ্ধিমান, পড়াশোনা ভালো করে। মা বলল পড়াশুনা তো ভালো করে কিন্তু আমার হাড় মাস জ্বালিয়ে খাচ্ছে।

প্রতিদিন পাড়ার মানুষ ওকে নিয়ে নালিশ জানাতে আসে। ওকে নিয়ে কি যে করি তুমি এসেছ যখন ওকে নিয়ে যাও ওকে নিয়ে আমি আর পারছি না। এই ভোলা তোর বাবাকে ডেকে নিয়ে আয়। ভোলা বলল আমি যাব না। বাবা আমাকে মারবে। মা বলল নিশ্চয়ই আবার কি অঘটন ঘটিয়েছিস তুই। মামা হাসতে হাসতে মাকে সব বললেন। মা বলল দেখেছো দাদা? পাড়ার মানুষও ওর জ্বালায় টিকতেই পারে না। ওকে নিয়ে গেলেই আমি একটু বাঁচি। এরপর ভোলার মামা ভোলা কে নিয়ে চলে যায়। ভোলার মামার একটা ছোট্ট মেয়ে আছে। কোন ছেলে ছিল না। তাই তার মামা, মামি তাকে খুব ভালোবাসতো। নিজের ছেলের মতোই দেখত। ভোলাও তার মামা মামির কাছে দুষ্টুমি করত না। সে ওখান থেকে মেডিকেল কলেজে সুযোগ পেয়ে যায় । ভোলা এখনো অনেক বড় হয়েছে। সে এখন পাস করা ডাক্তার। গ্রামের মধ্যে একটা চেম্বার খুলেছে গ্রামের গরীব মানুষদের ফ্রি চিকিৎসা করে। আজ ভোলার বাবা, মা ও তার মামা, মামি ভোলাকে নিয়ে গর্ব করে। মামা তার মেয়ের সঙ্গে ভোলার বিয়ে দিয়েছে। গ্রামের সেই দুষ্টু ছেলেটা আজ কত বড় ডাক্তার হয়েছে। গ্রামের মানুষও ভোলাকে খুব ভালোবাসে। গ্রামের সবথেকে দুষ্টু ছেলেটা আজ গ্রামের সকলের প্রিয় মানুষ।।

শিক্ষার চিন্তা

লিলুফা খাতুন,
জেনারেল, ষষ্ঠ সেমিস্টার

পরীক্ষাটা আসছে হেঁটে
শুনছি পায়ের শব্দ ।
সারাদিনের দুষ্টুমি সব
এক নিমেষে জব্দ ।
সকাল সন্ধ্যে বই খাতা পেন
এমন পড়ার ধুম ।
শীতের রাতেও লেপের নিচে
অনিশ্চিত ঘুম ।
দাদা বলছেন ষ্টার মার্কস
বাবা বলছেন দেখো
চেনাশোনা লোকের কাছে
মানটি আমার রেখো ।
পরীক্ষার সব চিন্তায় ভাই
কাঁপিয়ে ওঠে প্রাণ ।

NOT SO USUAL

Sania Beg
English Honours, 2nd Semester

There was a turmoil, the bell racked.
"He is unusual", the boys mocked,
There was reason why they so reckoned.
Clouds hour his face,
He runs away in such case,
But that very day:
With his not so natural being,
He cried out with his voice clearing,
"Yes, not a manly man like you,
My hands adorn more in the kitchenware.
Then with that pretty cigar with which you so dare.
My presence feels the girls most
Cause my heart mocks less and lover more.
My muscles not as strong as Hercules,
Can't they shackle the rivalry;
But my mind can definitely shackle
Your so-called "usual" boundary.
The bell rang but the class fell quiet.

বিজ্ঞান ও ইসলাম

অধ্যাপক মোঃ গোলাম রসূল হালদার (দর্শন বিভাগ)

এই সৃষ্ট ইহজগত ও পরজগত পরম করুণাময় আল্লাহর অপার রহমত। তাঁর সৃষ্ট জীবকুলের মানুষই শ্রেষ্ঠ। তিনি মানুষকে সর্ব শ্রেষ্ঠ সম্পদ, বুদ্ধি দিয়ে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন তাঁর সৃষ্টিকে যথাযথ ভাবে ব্যবহার ও তাঁর শুকরিয়া আদায়ের জন্য।

সুদূর আদিমকাল থেকে মানুষ আজ পর্যন্ত চলতে চলতে অগ্রগতির শিখরে পৌঁছেছে । এর জন্য অবশ্যই বিজ্ঞানের অবদান স্বীকৃতি দাবি রাখে। কিন্তু বিজ্ঞানের পূর্বেই সৃষ্টি পর্বে ধর্মের অবস্থান অর্থাৎ স্রষ্টা ও সৃষ্টির রহস্যকে মৌলিকভাবে মূল (root) ভাবা একেবারেই অমূলক কি?

এখন আসবো আমি মূল কথায়- আজকাল প্রায় শোনা যায় যে, বিজ্ঞানের এই চরম শিখরের দিন কি ইসলাম পিছিয়ে পড়ছে? সোজা কথায়- বিজ্ঞান না ইসলাম- কে এগিয়ে আর কে পিছিয়ে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারি বিস্ময় নিয়ে আসে জিজ্ঞাসা আর বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সেই জিজ্ঞাসার (প্রশ্নের) উত্তর খুঁজে বেড়ায়।

এখন 'বিজ্ঞান' (Science) শব্দটির বাংলা অর্থ 'বিশেষ জ্ঞান' অর্থাৎ প্রকৃতির একটি নির্দিষ্ট বিভাগ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট, সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখল জ্ঞান দান করে যে শাস্ত্র তাকে বলে বিজ্ঞান। এই বিশেষ বিশেষ খণ্ডজ্ঞানের সুবাদে আমরা আজ বৈজ্ঞানিক শিখর জগতে এসে পৌঁছেছি, এই বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও প্রযুক্তি আমাদেরকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। অবশ্য একদিনে তা সম্ভব হয়নি, এর জন্য কোটি কোটি বছর পার করে চলতে হয়েছে ও হচ্ছে।

এবার দেখে নেব ' ইসলাম 'বলতে কি বুঝি? 'ইসলাম' শব্দটির উৎপত্তি আরবী 'আসলামা ইউসালিমু ইসলামান' অর্থাৎ পরম করুনাময় স্রষ্টা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা, অন্য কথায় 'ইসলাম' শব্দের অর্থ 'শান্তি'। একটু খোলা চোখে তাকালে দেখা যাবে দুটোর মধ্যে তফাৎ তো নেই বরং বলবো বিজ্ঞান ইসলামের অনুসারী। ইসলামিক জ্ঞান অখন্ড জ্ঞান। ইহজগৎ, পরজগৎ সমস্ত কিছুই তার অন্তর্গত। এক কথায় সমস্ত সৃষ্টি তার আলোচনার অন্তর্গত।

আল্লাতায়ালার সমস্ত সৃষ্টির রহস্য হলো তাঁর নেয়ামতের শোকর জানানোর জন্য। সৃষ্টির পূর্বে সবই ছিল শূন্য তারপর পরম করুনাময় 'কুন' শব্দের উচ্চারণে সবকিছুই সৃষ্টি করলেন। সেই সৃষ্টির মধ্যে মানুষ হলো শ্রেষ্ঠ জীব। এই বিশ্ব দুনিয়া সৃষ্টি প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের মত হল কয়েকটি উপাদানের সমষ্টি, যথা মাটি, পানি, আগুন, বাতাস (Earth-Water-Fire-Air), আকাশ (Elther) এখানে গৌণ। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন – "তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যে সমস্ত রংবেরঙের বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছি, আর এতেও যে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে"- (আল নাহল : ১৩)।

বিজ্ঞানের আলোচনা কেবল এই দৃশ্যমান লৌকিক জাগত নিয়ে (Pheno memal world)। অধিবিদ্যা, পরলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় জগত (Metaphysical world) তার আলোচ্য বিষয় নয়। তাই বিজ্ঞান এই প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যায়। যেমন এই জগতের স্রষ্টা কে? এই জীবনের পরে পরজীবন কি? ইত্যাদি প্রশ্নের কোন উত্তর তাদের কাছে নেই অথচ মজার ব্যাপার হলো এই সব আবশ্যিক প্রশ্নের উত্তর আমরা কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারি না আর পারব ও না কোনদিন।

একটা কথা বলতে হয় আমরা উন্নত প্রযুক্তির যুগে বসবাস করছি, তার মূলে অবশ্যই বিজ্ঞানের অবদান স্বীকার করতে হবে। কিন্তু বিজ্ঞানের সৃষ্টি যে ইসলাম থেকে একথা ভুললে সত্যকে অস্বীকার করার শামিল। বিজ্ঞান কারিগর হতে পারে এবং সেটার যে আসল স্রষ্টা অবশ্যই তাঁকে মনে রাখতে হবে। ওই যে বললাম বিজ্ঞানের কাজ কেবল দৃশ্যমান জগতকে নিয়ে।

কে আমরা? কোথা থেকে এলাম? মৃত্যুর পরে কোথায় যাব? এসবের উত্তর বিজ্ঞানের কাছে নেই - তাই বিজ্ঞানে এইসব বিষয়ে অজ্ঞেয়তাবাদী। কিন্তু স্রষ্টা- সৃষ্টি -ইহকাল -পরকাল এসবের খাঁটি উত্তর আছে 'পবিত্র কোরআনে'। যাই হোক বিজ্ঞান আমাদের জীবন যাত্রার উন্নতি ঘটিয়েছে তার নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে থেকে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বিজ্ঞান সব পারে না। যদি পারতো তাহলে মারনাস্ত্র আবিষ্কার করছে - কিন্তু সামান্য জীবন দায়ী 'রক্ত' (Blood) তো তৈরি করতে পারছে না। কারণ সেটা সৃষ্টিকর্তার হাতে। ইসলামের পবিত্র 'কোরআনে' জগত, জীবন, সৃষ্টি, স্রষ্টা এমনকি সবকিছুর ব্যাখ্যা পরিষ্কারভাবে মানবজাতির সামনে মাইলস্টোনের মতো দাঁড়িয়ে আছে আর সেজন্য বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে বিজ্ঞানীরা কোরআনের উপর রিসার্চ করে কোরআনের বাণীর সঙ্গে সহমত পোষণ করছেন।

তাই কলেবর না বাড়িয়ে শেষ কথায় বলবো বিজ্ঞান সৃষ্ট জগতের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, তাই বলেই মূল ইসলামকে আমরা কখনো পিছনে ফেলতে পারি না কারণ বিজ্ঞানের ভিত্তি হল ' ইসলাম '। আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন “লোকে কি বলে যে - তিনি নিজেই (মোহাম্মদ) রচনা করে এনেছে? (উত্তরে) আপনি বলুন: তাহলে তোমরাও এমন একটি সূরা রচনা করে তো দেখি এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে পারো তোমরা তাকে ডেকে আনো যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো "। (ইউনুস: ৩৮)

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও সুন্দরবন সভ্যতা

অধ্যাপক বাবলু নস্কর

ইতিহাস বিভাগ

বিশ্বসভ্যতায় যেসকল ম্যানগ্রোভ অরন্যানী সমৃদ্ধ জীব-বৈচিত্র্য পরিশিলীত বাদাবনের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে অন্যতম হল গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ সন্নিবেশিত সুন্দরবন। এটি লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা নদের সঙ্গম স্থলে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত। সুন্দরী, গরান, গেঁওয়া, হেতাল, কেওড়া, ধুন্দুল, হোগল, পশুর প্রভৃতি লবণাম্বু উদ্ভিদ সমৃদ্ধ চিরহরিৎ অরণ্যনী ও বিচিত্র প্রাণীকুলের সহাবস্থানের প্রেক্ষিতে সুন্দরবন জীব-পরিমণ্ডল (Sundarban Biosphere Reserve) সংরক্ষণ রূপে বিশেষ স্থান লাভ করেছে এবং UNESCO কর্তৃক ১৯৮৯ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান (World Heritage Site) হিসেবে ঘোষিত হয় । এরূপ গভীর অরণ্য সমৃদ্ধ বাদাবন মানব সভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষায় চির অনবদ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও বর্তমান বিশ্ব উষ্ণায়নের কালপর্বে জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধির সাথে সাথে এর উজ্জ্বল অবস্থিতিমানতা ক্রমহ্রাসমানতায় পর্যবশিত হতে শুরু করেছে । আগামী কয়েক দশকের মধ্যে এই বনাঞ্চলের স্বাভাবিক অস্তিত্ব ক্রমশ সংকোচনশীল হওয়ার অনিবার্যতায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবন ধারায় আশু ফল অশুভ ধারায় প্রবাহিত হতে থাকবে, যা মানব সভ্যতার অস্তিত্বের ক্ষেত্রে এক অশনি সংকেত।

সৌরজগতের বৃহৎ সংসারে পৃথিবী একমাত্র গ্রহ যেখানে আছে প্রাণ সৃষ্টির প্রয়োজনীয় উপকরণ ও প্রানের অস্তিত্ব। এই প্রাণ সৃষ্টি ও তার লালন-পালনের জন্য আলো-উষ্ণতা একান্ত প্রয়োজন। যার একমাত্র উৎস হলো সূর্য। সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত তাপীয় শক্তি বায়ুমন্ডলে গ্যাসীয় আস্তরণে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং প্রাণ সৃষ্টির উপযোগী উষ্ণতা বজায় থাকে। তবে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ যদি অস্বাভাবিক ভাবে হ্রাস পায় তাহলে পৃথিবীর বুকে নেমে আসতে পারে তুষার যুগ। অপরদিকে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (Co^2) এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বাড়তে থাকে তাপমাত্রা, যা ঘটছে বর্তমান পৃথিবীতে। এই তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে বলা হয় Global Worming বা বিশ্ব উষ্ণায়ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সমুদ্র উপকূলবর্তী দীপাঞ্চল সুন্দরবনে তার প্রভাব, উদ্ভূত সংকট ও তা প্রশমনের প্রয়াসলব্ধ অভিপ্রায় আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়।

আলোচ্য বিষয়াদিতে পরিবেশিত 'বিশ্ব উষ্ণায়ন' সম্পর্কে বোঝার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রীন হাউস প্রভাব সম্বন্ধে অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীতে গ্রীন হাউসের উপাদানের অন্যতম হল কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ওজন, মিথেন, ক্লোরো ফ্লুরো কার্বন, নাইট্রাস অক্সাইড, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি। এই গ্যাস সমূহের তাপ ধারণ করার ক্ষমতা আছে। তাই বায়ুমন্ডলে এই গ্যাসগুলি বৃদ্ধি পেলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পায়, যাকে বলা হয় গ্রীন হাউস প্রভাব।

সমীক্ষায় দেখা গেছে ১৯৫০ সালে বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর গড় ঘনত্ব ছিল শতকরা ০.০২৮ ভাগ, যা ২০০৫ সালে রেকর্ড বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ০.০৩৭৯ ভাগ। ওই বছরের গড় তাপমাত্রাও ছিল সর্বাধিক। বর্তমানে প্রতি বছর বায়ুমন্ডলে গড়ে ১.৫ PPM হারে Co^2 বাড়ছে। বাতাসে এই হারে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি পাওয়ায় বিগত শতাব্দীতে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা এই হারে বাড়তে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াবে ৩.৫°সেলসিয়াস।

উষ্ণায়নের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের নানা পরিবর্তন এখনই দেখা যাচ্ছে, সেগুলোর অন্যতম হল- মেরু প্রদেশের বরফ স্তরের গলন, পর্বতের চূড়ায় অবস্থিত হিমবাহের ক্ষয়, সামুদ্রিক প্রবাল ক্ষেত্রের ধ্বংস, সমুদ্র তলের উচ্চতা বৃদ্ধি, গরম সমুদ্র স্রোতের প্রবাহ প্রভৃতি। এর প্রভাবে মানব সমাজ ও পৃথিবীর সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের ব্যাপক বিপর্যয় শুরু হয়েছে, শুরু হয়েছে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের ক্রমিক অবক্ষয়।

পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবনের জীব-বৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্র কি ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। অবশ্য বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামে এ বিষয়ে আলোচনা চলছে। প্রথমে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্রের সামান্য পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ২৫,৫০০ বর্গ কি.মি. অবিভক্ত সুন্দরবনের মধ্যে ১০২ টি দ্বীপের সমন্বয়ে প্রায় ৯৬৩০ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত ভারতীয় সুন্দরবন। এর মধ্যে ৫৪ টি দ্বীপে বনভূমি হাসিল করে বসতি গড়ে উঠেছে। বাকি দ্বীপগুলি সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসাবে ঘোষিত। অসংখ্য খাঁড়ি, নদী, খাল পরিবেষ্টিত এই অঞ্চল- চিরহরিৎ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, বন্যপ্রাণী, জলজ প্রাণী, পাখি, সরীসৃপ প্রভৃতি নিয়ে বিরাজ করছে। কিন্তু বিগত শতাধিক বছরের মধ্যে সুন্দরবনে বাস্তুতন্ত্রের এবং আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে এই অঞ্চলে উদ্ভিদ ম্যানগ্রোভ ও প্রাণী বৈচিত্র্যের আমুল পরিবর্তন ঘটেছে। এর ফলে অনেক উদ্ভিদ, অনেক প্রাণী প্রজাতি যেমন জাভান গন্ডার, বুনো মহিষ, বার্কিং ও সোয়াম্প হরিণ বিলুপ্ত হয়েছে। অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি বিলুপ্তির রক্ত চক্ষুর সামনে দাঁড়িয়ে।

বিশেষ করে বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধির লক্ষণীয় প্রভাব দেখা যাচ্ছে মেরু প্রদেশের বিস্তীর্ণ বরফ ঢাকা অঞ্চলে। শুরু হয়েছে দীর্ঘকালের জমাট বাঁধা বরফের গলন। অন্যদিকে সমুদ্র জলতলের তাপমাত্রা যাকে Sea Surface Temperature (SST) বলা হয়, তার বৃদ্ধির কারণে সমুদ্র জলস্তর ফুলে ফেঁপে উঠবে। বিজ্ঞানীদের মতে এই জলস্ফিতির কারণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমুদ্র ও উপকূলবর্তী দেশগুলি বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। সমুদ্র সন্নিহিত এলাকা গুলি জলের তলায় চলে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার শীর্ষে বাংলাদেশ ও ভারতীয় সুন্দরবন। প্রাপ্ত সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, ১৯৫০ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে সমুদ্র জলতলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৫ সেমি। ভারতীয় উপমহাদেশ সন্নিহিত সমুদ্র জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধির বার্ষিক গড় যেখানে ২.৫ মিমি, সেখানে ভারতের পূর্ব উপকূলে এই বৃদ্ধির হার ৩. ১৪ মিমি। এই তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী ২০৩২ সালে জলস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে বর্তমানের চেয়ে ৩ সেমি বেশি। ২০৫০ সালে সেটি আরও ১৫ সেমি বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সমুদ্র উপকূল সন্নিহিত সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলের তলায় চলে যেতে পারে। এর সাথে যুক্ত হবে ভূমিক্ষয়ের মতো ঘটনা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ওসেনোগ্রাফির বিশেষজ্ঞদের মতে ২০৪০ সাল নাগাদ সুন্দরবনের ১৫ শতাংশ এলাকা জলের মধ্যে নিমজ্জিত হবে এবং এর ফলে সাত লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে পরিবেশগত শরণার্থীতে পরিণত হবে। চিরহরিৎ সুন্দরবনের অরণ্য স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বিস্তার লাভ করে থাকে। সমুদ্র জলের লবণতা বেড়ে যাওয়ায় এবং মিষ্টি জলের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার কারণে এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে। বিলুপ্ত হবে ম্যানগ্রোভের অনেক প্রজাতি। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সন্নিহিত জলাভূমি, নদী, খাড়ি, খাল প্রভৃতি সামুদ্রিক প্রাণী ও মাছের আঁতুড়ঘর হিসাবে সুবিদিত। অনেক সামুদ্রিক এবং জলজ প্রাণীর জীবন চক্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক স্তর এই অঞ্চলেই লালিত হয় এবং পুষ্টি লাভ করে

সমুদ্র জলের উপরিতলের তাপমাত্রা (SST) এবং লবনের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে এই অঞ্চল এই সকল প্রাণীর বংশবিস্তার এবং বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে। অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হবে, অনেক জলজ প্রাণী স্বাভাবিক বাসস্থান পরিবর্তনে বাধ্য হবে। এর ফলে সুন্দরবনের বহু মানুষ জীবিকা হারাবে।

বাস্তুতন্ত্রে সমুদ্র জলের খাদ্য পিরামিডের সর্বনিম্ন স্তরে আছে প্ল্যাঙ্কটন জাতীয় ক্ষুদ্র জীব, যারা অপর জলজ প্রাণীর আহার্য। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ সন্নিহিত জলাভূমিতে এগুলির স্বাভাবিক বৃদ্ধি জৈবিক এবং প্রাকৃতিক কারণে খুবই ভাল। কিন্তু জলের উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে এই প্ল্যাঙ্কটনের পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে এদের উপর নির্ভরশীল প্রাণীরা খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হবে। আর খাদ্য পিরামিডের কোন একটি স্তর বিলুপ্ত হলে বা হ্রাস পেলে সমগ্র বাস্তুতন্ত্রে ব্যাপক প্রভাব পড়বে। সুন্দরবন সন্নিহিত বাস্তুতন্ত্র এই বিপদের সম্মুখীন।

বিশেষত সুন্দরবনের দ্বীপগুলিকে মূলত মাটির বাঁধ দিয়ে সমুদ্র ও নদীর জল থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, গড়ে উঠেছে জনপদ, কৃষি জমি, অন্যান্য পরিকাঠামো। ৩.১৫ লক্ষ হেক্টর কৃষি জমির উপর নির্ভর করছে এই অঞ্চলের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি। সম্প্রতি প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে, গড় নিম্ন তাপমাত্রা যদি এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পায় তাহলে এই অঞ্চলের ধানের উৎপাদন প্রতি হেক্টরে গড়ে ৬০ কেজি হ্রাস পাবে। ইতিমধ্যে শীতকালের সময়সীমা হ্রাস পাওয়ায় এবং শীতকালে গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় শীতকালীন ফসল এবং রবিশস্যের চাষ ব্যাহত হচ্ছে, উৎপাদন কমছে। উৎপাদন হ্রাসের ফলে ভবিষ্যতে সুন্দরবনের জনগোষ্ঠী খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হবে।

উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া নিম্নচাপ সাইক্লোন, প্রবল বর্ষণ, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতির প্রকোপ বাড়বে এবং তাতে সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষতি হবে। ভূমিক্ষয় ও নিচু দ্বীপগুলি প্লাবিত হওয়ার ফলে সুন্দরবনের বেশ কিছু অঞ্চলের কয়েক হাজার অধিবাসী বাসস্থান হারাতে পারে। কেবলমাত্র হতাশা প্রকাশ করে কিংবা ভবিতব্যের হাতে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সম্ভাব্য বিপর্যয়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা কোন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সমাজের কাজ হতে পারে না। অবশ্যই একথাও সত্য, বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রক্রিয়ায় ইন্ধন যোগানোর ক্ষেত্রে সুন্দরবনবাসীর ভূমিকা ততটা উল্লেখযোগ্য নয় । তা সত্ত্বেও প্রকৃতির অকৃপণ মাধুরী ও জীব বৈচিত্রের অপার সম্পদের অধিকারী পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপকে ভবিষ্যৎ বিপর্যয় থেকে বাঁচাতে আমাদেরও কিছু সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে যেমন প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। তেমনি স্থানীয় প্রশাসন, পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমূহ, সর্বোপরি সুন্দরবনের সমস্ত অধিবাসীদের সচেতনভাবে সদর্থক ভূমিকা পালন করতে হবে।

তবে পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়নে যে সকল বিধি ইতিমধ্যে চালু হয়েছে তা কার্যকর করা একান্ত আবশ্যক, যেগুলি হল - ১) নদী বাঁধের দুদিকে ম্যানগ্রোভ এবং উপযোগী বনভূমি সৃষ্টি করে প্রাকৃতিক প্রাচীর গড়ে তোলা, ২) বনভূমি, বনজ সম্পদ, জলজ সম্পদ সংরক্ষণে আরও কঠোর আইন প্রণয়ন ও তা প্রয়োগ করা, ৩) প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ সীমিত ও বিজ্ঞানসম্মত করা, ৪) 'প্লাস্টিক বর্জিত অঞ্চল' এর ঘোষণা কে সার্থক করা, ৫) বিদ্যালয়-এর ছাত্র-ছাত্রী এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যদের বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করে সক্রিয় রাখা। ৬) যানবাহন ও দৈনন্দিন কাজে যতটা সম্ভব প্রাকৃতিক শক্তি ও অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার বাড়ানো। এগুলি কার্যকরী করার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনকে আরও সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

সুন্দরবন অঞ্চলের প্রান্তিক মানব জীবনধারা বহুলাংশে নির্ভরশীল এখানকার বনজ সম্পদাবলীর উপরে। জাঙ্গলিক সম্পদ সামগ্রী যথা মোম, মধু, কাঠ, গোলপাতা ও গহন অরণ্যে প্রবেশিত স্রোত ধারায় বিদ্যমান সামুদ্রিক কাঁকড়া এই অঞ্চলের ভূমিহীন দরিদ্রতর মানুষের জীবিকার একান্ত অন্বেষিত উপাদান। যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত তাদের প্রাত্যহিক জীবনধারা। উষ্ণায়নের ভবিষ্যতিক প্রভাব ও তার ফলশ্রুতিতে এই ব-দ্বীপ ভূমির অস্তিত্বের সংকটের সাথে সাথে বনাঞ্চলের অবলুপ্তিকে কেবল অনিবার্য করে তুলবে না, সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্র তথা জীব-বৈচিত্র্য ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট উষ্ণায়ন প্রসূত পরিবেশ পরিস্থিতি ক্রমশ হয়ে উঠবে বিভীষিকাময়। তাই স্বাভাবিক গাছ-গাছালি তথা বন-জঙ্গলকে ধ্বংসলীলা থেকে বিরত হয়ে উষ্ণায়নকে রোধ করার একান্ত প্রয়াসমূলক উদ্যোগ গ্রহণ মানব সভ্যতার নিকট নিশ্চয়ই কল্যাণকর হবে, রক্ষা পাবে এই ধরিত্রী।।

গ্রন্থপঞ্জি:

১) জানা, দেবপ্রসাদ (সম্পাদনা), শ্রীখন্ড সুন্দরবন, দীপা প্রকাশন, কলকাতা, ২০২০

২) সেনগুপ্ত, সুধীন, সুন্দরবন জীব-পরিমন্ডল, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১২

৩) Das, Gautam Kumar, Sundarbans environment and ecosystem. Sarat Books Distributors, Kolkata, 2011

৪) Mandal, & Parna, Sundarbans An Ecological History, Readers Service, Kolkata, 2004.

অনাহারী

রাকিব সেখ

ইংরেজি অনার্স, চতুর্থ সেমিস্টার

ও মা, দু'টো ভাত দেবে গো...
এই অনাহারীর মুখে ?
কত দিন যায় মা গো, কত দিন আসে –
মোরা কত দিন করি পার, বাঁচতে চেয়ে সুখে !

জগৎ তো মা সদাই মেতে,
ইদ-পূজো আর পার্বণে।
মোরা দিন হতে দিন পাইনা খেতে,
মোদের দিন কাটে করুণ ক্রন্দনে।
মোরা বঞ্চিত বলে বিবেচিত হই,
বিবেচিত করে এই সমাজ।
মোরা দিন হতে দিন অনাহারে রই –
তাই, চেয়ে খেতে মোরা বাদ্ধ আজ।

Silent Love

Sk Samsur Rahman
English Honours, 4th Semester

In the quiet of the night,
When the stars are shining bright,
My thoughts wander to you,
My love, my heart, my boo.

Your smile, your laugh, your touch,
They all mean so much,
To me, your love is a treasure,
That fills me with joy and pleasure.

Every moment spent with you,
Is like a dream come true,
Your beauty, your grace, your charm,
Makes my heart skip a beat and warm.

I never thought I'd find someone,
Who could make my heart sing and run,
But then you came into my life,
And everything felt just right.

So, here's to you, my love,
The one l've been dreaming of,
I promise to love you forever more,
My heart, my Soul, My amour.

জঙ্গলে সেই রাত

সাকলিন গাজী
ষষ্ঠ সেমিস্টার

কলেজে এখন আমাদের পরীক্ষা চলছে, পরীক্ষার কয়েকদিন আগেই আমি, রোহিত, রোহান সাহিল এবং আসিফ সবাই মিলে প্ল্যান করে ছিলাম যে পরীক্ষা শেষ হলেই আমরা এই কজন মিলে পিকনিক করবো।

সব পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমরা পাঁচজন মিলে প্রসাদপুরে সরিষাখালি এলাকায় পিকনিক করতে যাব। সব কিছু প্ল্যান করে কাল রাতে হাঁড়ি, একটা চল্লিশ লিটারের জলের ড্রাম, একটা বড় সাইজের কড়াই আর পাঁচ কেজি মুরগির মাংস আনা হয়েছিল ।

মুরগির মাংসটা প্রথম সকালে পাবো না বলে কাল রাতে মাংসটা কিনে এনে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম ।সকাল হতে না হতে রোহিত তার বাবার চারচাকা গাড়িতে সব মালপত্র, বাজারহাট করে ব্যাগ গুছিয়ে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম সরিষাখালীর উদ্দেশ্যে। আমরা বারুইপুর থেকে রওনা দিয়ে বেশ অনেকটা পথ আসার পর গাড়ির ভিতরে বসে রোহিত গাড়ি চালাতে চালাতে বিরক্ত হয়ে রোহানকে বলল - 'কি করে তুই বলেছিলিস সরিষাখালী খুব কাছে'। এদিকে সাহিল পাশ থেকে বলে উঠতে লাগলো- সরিষাখালি যাওয়ার থেকে বারুইপুরের মধ্যে অনেক ভালো ভালো পিকনিক স্পট ছিল, তা নয় যতসব!

এতদূরে পিকনিক করার কি দরকার ছিল? বেলা একটা বেজে গেল এখনও পর্যন্ত সেই জায়গার দেখা মিলল ন, এই নিয়ে রোহিত, রোহান আর সাহিলের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়ে গেল । তাদের ঝগড়া বাড়ছে দেখে আমি তাদেরকে একটা বড় হাঁক দিয়ে চুপ করিয়ে দিই । আর বললাম তোরা চুপ কর তো, বেশি ঝামেলা করিস না। এরকম করলে কিন্তু আমি গাড়ি থেকে নেমে যাব। আরেকটু এগিয়ে দেখা যাক। সনুর কথা শুনে তার পায়ের কাছে থাকা কুকুরটা মানে টাইগার ধমকে স্বরে ডেকে উঠল ঘেউ ঘেউ করে । (সনু হচ্ছে এই গ্রুপের লিডার, সে বন্ধুদের ডাকাবুকো ধরনের। অন্যদের বিপদে সে সব সময় ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই সনুর কথাই প্রায়ই সবাই শুনে থাকি ।)

আমাদের পাঁচ জনের মধ্যে একমাত্র আসিক ভোস ভোস করে ঘুমাচ্ছে। গাড়িতে উঠলেই যেন তার ঘুমিয়ে পড়া একটা স্বভাব । যেন পিকনিক করতে নয় ঘুমানোর জন্যই সে বেরিয়েছে ।

কিছুটা এগোনোর পর দূর থেকে দেখতে পেলাম রাস্তা দুভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তাদেখে রোহিত বলল - নাও বোঝ এখন, কোন দিকে রাস্তা তা কে জানে ?, কিন্তু যেখানে ভাগ হয়েছে ঠিক দুটো ভাগ হওয়ায় রাস্তার মাঝখানে একটা পুরানো বাঁকাটেরা পেয়ারা কাঠ মাটিতে পোঁতা আছে এবং পেয়ারা কাঠের গায়ে একটা পুরনো বোর্ডে কালো রঙের আলকাতরার কালি দিয়ে লেখা আছে '' সরিষাখালী '', আর সেটা ডানদিকে তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে । এটা দেখে শুধু রোহিত নয় সাইনবোর্ড দেখে সনু সহ সবাই আনন্দে উল্লাস করতে লাগলো । এমনকি আসিফও ঘুম ভেঙ্গে উঠে বলল 'আমরা কি পৌঁছে গেলাম না কি ?' রোহিত সরিষাখালীর যাওয়ার নির্দেশিত পথে ডানদিকে গাড়ি ঘুরিয়ে দিল। ক্লান্তি বুজে আবার নতুন উদ্যমে এগোতে থাকলো ।পথের দুপাশে ঝোপ-ঝাড় কিছুক্ষণের মধ্যে বদলে যেতে লাগলো বড় বড় গাছে । দু-পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলো একে অপরে প্রসারিত হয়ে যাত্রার পথে ছায়ার মতো ঢেকে রেখেছে গোটা পথটাকে। রোদের আলো উঁকি দিচ্ছে তাদের ফাঁক দিয়ে। এক সময় মাথার উপর সেই ছায়ার আস্তরণ আস্তে আস্তে আরো ঘন হতে লাগলো। ছায়াময় হয়ে উঠল গোটা পথটা, ধীরে ধীরে গাড়িটা সামনের দিকে এগোতে লাগলো। কিন্তু বেশ খানিকটা পথ এগোবার পরও কোন লোকালয়ের দেখা মিলল না। আবারো কেমন যেন আশঙ্কার দানা বাঁধতে শুরু করলো সবার মনে। গাড়ি চালাতে চালাতে রোহিত বলল- ''আরে এদিকেও পথ শেষ হচ্ছে

আর সামনে এত খারাপ রাস্তা ভাই '। ঠিক এই সময়ই কিছুটা তফাতে রাস্তার পাশে জঙ্গলের ভিতর থেকে একজন লোক বেরিয়ে গাড়িটার উদ্দেশ্যে হাত তুলে দাঁড়ালো । রোহিত তার সামনেই ব্রেক কোষে গাড়িটাকে দাঁড় করালো। মাঝ বয়সী একটা লোক, আমি ভালো করে তাকালাম তার দিকে। গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ানো লোকটার চোয়াল ও মুখের গঠন কি রকম অদ্ভুত ধরনের । মুখটা ছুঁচালো, নাকের নিচে ঝাঁটার কাঠির মত এক গুচ্ছ গোফ, খালি গা, খালি পা, পরনে শুধু পুরনো হাফপ্যান্ট, তাকে দেখলেই মনে হয় স্থানীয় গ্রামীন মানুষ ।

আমি লোকটাকে বললাম - 'আমরা পিকনিক করতে যাচ্ছি সরিষাখালী। সেই জায়গাটা কতদূর, আর গাড়িটা থামালেই বা কেন?' লোকটা হলুদ দাঁত বের করে হাসলো, তারপর বলল- 'আপনারা ভুল পথে চলে এসেছেন বাবু। ওজায়গা বিশ মাইল পিছিয়ে রাস্তা যেখানে দুই ভাগে ভাগ হয়েছে সেখান থেকে বামদিকের পথ। ' কথাটা শুনে আমিও অবাক হয়ে গেলাম ! আর বললাম- 'কিন্তু ওইদিকে সাইন বোর্ড এ লেখা ছিল এদিকে সরিষাখালী '। 'আপনারা ভুল পথে এসেছেন' শুনে চমকে উঠল সবাই। ভুল পথে চলে এসেছি আমরা । বেলা প্রায় দুটো বাজতে চলেছে । গাড়ি ঘুরিয়ে কখনই বা সেই পথে পৌঁছব। তারপর রান্নাবান্না করে কখনোই বা তারা খাবে, নাকি পিকনিক না করেই তারা বারুইপুরে ফিরে যাবে।

গাড়ির পিছনের দিকে হাঁড়ি, কড়াই, বাজার ইত্যাদি মালপত্র রাখা আছে। সেগুলো দেখতে পেয়ে আর সনুদের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে লোকটা এবার তাদেরকে বলল - ' বাবুরা ইচ্ছে করলেই এখানে পিকনিক করতে পারো। এই খানিকটা এগিয়ে সামনেই আমার বাড়ি আছে, আর ওখানে বেশ অনেকটা জায়গা আছে পিকনিক করা যাবে। লোকটার কথা শুনে সাহিল অন্যদেরকে বলল, 'দেখ কথাটা কিন্তু মন্দ নয়। আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। ওই বাড়িতে গিয়েই ওখানে চড়ুইভাতী করে নিই চল'।এদিকে আবার রোহান বলে উঠলো - ' কি ! ওই বাড়িতে যাবি ? না না অন্য কোন জায়গা দেখ, ওখানে যেতে হবে না '। রোহান আবার এসব জঙ্গলের ভিতরে বাড়ি, ভুতুড়ে জায়গা পছন্দ করেনা, ওর ভূতের নাম শুনলেই বুক শুকিয়ে যায়। মুচকি হাসি দিয়ে সাহিল বললো- ' কিরে জঙ্গলের ভিতরে বাড়ির নাম শুনে ভয় পেলি নাকি ?' তখন রোহান বলল, 'দূর ভয় পাবো কেন, ওসব ভয় আমি পাইনা '। সবার কথা শুনে আমি বললাম, ' ঠিক আছে তাহলে ওই বাড়িতে গিয়েই পিকনিকটা করে নিই। '

টাইগার শুয়ে ছিল আমার পায়ের কাছে, টাইগারের গলার চেন টানতেই কুকুরটা প্রথমেই উঠে দাঁড়ালো, ভালো করে গা ঝারলো, তারপর গাড়ির জানালার বাইরে লোকটাকে দেখতে পেয়ে তীব্র গর্জন করে উঠলো ঘেউ ঘেউ করে । কুকুরটাকে আগে দেখতে পাইনি দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে। তীব্র গর্জন শুনে গাড়ির সামনে থেকে ছিটকে গেল লোকটা। তখন লোকটা চমকে গিয়ে এবং ভয়ের সঙ্গে বলল, 'ও কুকুরকেও আপনারা সাথে নিয়ে এসেছেন'। কুকুরটার ভয়ে লোকটা চলে গেলে মুশকিল হবে। সেই জন্য আমি সেই লোকটাকে বললাম, ' তোমার কোন ভয় নেই, ও কাউকে কোনদিন কামড়ায় না। তোমাকে নতুন দেখে চিনতে পারছে না বলেই এরকম করছে।'

গাড়ি থেকে নেমে পড়লো সবাই । আমি টাইগারের গলার চেন ধরে গাড়ি থেকে নামতেই সেই লোকটার দিকে তাকিয়ে গর্জন করে এগিয়ে গেল। আমি চেনটা ধরে টাইগারকে নিয়ে গাড়ি থেকে কিছুটা তফাতে গিয়ে আবারো লোকটাকে বললাম, ' ভয় পেয়ো না, একটু পরে তোমাকে চিনে ফেলবে, তারপর আর ডাকবে না। আমি তো ধরে আছি ওকে।' তোমার নাম কি ? সনুর কথা শুনে লোকটা একটু সাহস পেল এবং সে বলল, 'হ্যাঁ ওকেই ধরে রাখবেন, আমি কুকুর ভয় পাই'। আমার নাম দশরথ। অন্যরা সবাই গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল, গাড়ির ভিতর থেকে রান্নার বাসনপত্র, বাজার আর জলের ড্রাম এগুলো নামিয়ে নিল। সবাই যে যার মত মালপত্র ভাগ করে নিয়ে দশরথের পিছনে যেতে লাগলো। টাইগার তখনো ঘেউ ঘেউ করছে দশরথের দিকে তাকিয়ে ।

সবাই ওই বাড়ির জমিতে ঢুকে পড়ল কিন্তু ওই জমিতে ঢুকতেই টাইগারের গর্জনটা আরো

তীব্র হয়ে গেল। আমি টাইগারকে চুপ করাতে করাতে এগিয়ে চললাম, সামনে দেখলাম একটা পুরনো বাড়ি, দুই তিন শতক জায়গার উপর বিরাজমান। তার সামনে অনেকখানি জায়গা আছে।

আমি বললাম দেখো ভাই শীতের বেলা রান্না করে খেয়ে আজ আর বারাইপুর ফিরতে পারবো না । তার থেকে ভালো হবে এখন একটু আরাম করে রাতে পিকনিক করে এখান থেকে কাল প্রথম সকালে বেরিয়ে পড়বো। তখন রোহান ভয়ের সাথে বলল, ' রাতে তোরা এখানেই থাকবি নাকি? ' সনু একটু হেসে বলল, ' কি করে এই সময় জন্মে তুই ভূতের ভয় পাচ্ছিস! কিছু হবে না আমরা আছি তো সবাই '। 'বাবুরা তাহলে আজ রাতে এখানেই থাকবেন ' বলল দশরথ । সনু বলল, ' কেন কোন অসুবিধা আছে ? ' দশরথ বলল, ' না না অসুবিধা কিছু নেই । তাহলে আমি চলে গেলাম জঙ্গল থেকে কাঠ আনতে।' এই বলে লোকটা জঙ্গলে অনেক ভিতরে চলে গেল কাঠ পাতা নিয়ে আসতে। সবাই তখন বাড়ির ভিতরে একটা বড় ঘরে ঢুকে জামা প্যান্ট বদলে বাইরে বেরিয়ে এলো ।

সবাই বাইরে চারিদিকটা হেঁটে হেঁটে দেখতে লাগলো । কিছুক্ষণের মধ্যে দশরথ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে কাঠ পাতা রেখে রাতের খাবার তৈরির জন্য উনুন ধরাতে লাগলো। আমরা সবাই শতরঞ্চি পেতে তাসের আড্ডায় মাতোয়ারা হয়ে গেলাম। আমরা সবাই তাস খেলতে ব্যস্ত ছিলাম । কিন্তু টাইগারের চিৎকার থামানো গেল না । সে তখন থেকে ডেকেই যাচ্ছে।

তাসের আড্ডায় ব্যাঘাত ঘটতে দেখে রোহিত বলেই ফেলল ভাই তুই ওকে গাড়িতে রেখেই আয়। তখন রোহান সাহিল আর আসিক সেই সঙ্গে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ , ওকে বরং তুই রেখেই আয়, যে রকম করছে তোর কুকুরটা, আমাদের মাথা খারাপ করে দেবে।

আমি তখন উঠে টাইগারের চেনটা খুলে টানতে টানতে গাড়িতে রেখে লক করে চলে এলাম।

রোহান একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলো এই বাড়িতে ঢুকে তার মোবাইলের টাওয়ার নেই। সিগন্যাল উড়ে গেছে, পরে ঠিক চলে আসবে । কিন্তু এতক্ষণ হয়ে গেল এখনো পর্যন্ত ফোনের সিগন্যাল আসছে না কেন । তখনো রোহান সবাইকে বলল, ওই দেখতো তোদের টাওয়ার আছে কি না? বাড়িতে ফোন করে বলে দেবো, যে আজ রাতে এখানেই থেকে যাব । কাল সকালে বাড়ি ফিরব। রোহানের কথা শুনে সবাই তাদের মোবাইল দেখে বলল - কই না তো আমাদের ফোনেও কোন সিগন্যাল নেই।

এই কথাটি শুনে রোহান চিন্তায় পড়ে গেল । ঠিক সেই সময়ই দশরথ আমাদের সামনে এসে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে । তার রাতের রান্নার জোগাড় হয়ে গেছে, গরম জলও তৈরি, হাতমুখ ধুয়ে চাও খেতে পারব আর যদি ইচ্ছে হয় তাহলে মহুয়া। এক জার এনে রেখেছে দশরথ। ঠিক হল ছোট ছোট শালপাতার থালায় ঢেলে আজ মহুয়া খাবো সবাই।

আসিফ বলে উঠলো আজ রাতে তাহলে 'মহুয়া খাওয়া হবে', ওদিকে আমি বললাম আরে হ্যাঁ ঠিক শুনেছিস । রোহিত তখন বলল ঠিক আছে সবকিছু যখন আছে রাতে তাহলে ক্যাম্প ফায়ার হবে। সকালের থেকে ভালো রান্না করে দিতে হবে চাচা বললাম আমি।

দশরথ একটু মুচকি হেসে বলল ঠিক আছে বাবু ভালো করে রান্না করে দেব।

রাতে ক্যাম্প ফায়ার জ্বালিয়ে সবাই আগুনের চারপাশে ঘিরে নাচছে । হিন্দি, বাংলা, ভোজপুরি কোন গানই বাদ যাচ্ছে না । আগুন ঘিরে আমরা নেচে চলেছি উদ্যমে। সেই জঙ্গলে পরিবেশে যা একেবারেই বেমানান। ভাত, মুরগির মাংস আর মহুয়া খেয়ে রোহিত, রোহান সাহিল আর আসিকের নেশা তখন হাই লেভেলে । কিন্তু আমি সেই একটু খেয়ে আর খাইনি। সবাইকে বারণ করলাম চিৎকার চেঁচামেচি না করতে। কিন্তু কে শোনে কার কথা ! প্রচন্ড নাচানাচি করে সবাই যখন ক্লান্ত, তখন আমি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম দশরথ লোকটা আশেপাশে কোথাও নেই। তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। কই এতক্ষণ তো এখানেই ছিল। কোথায় গেল লোকটা ! পাশ থেকে নেশা অবস্থায় রোহিত বলল রান্নাবান্না হয়ে গেছে হয়তো সেজন্য চলে গেছে। কিন্তু আমার মনে ঠিক সুবিধা ঠেকলো না! সবাই নেশার ঘোরে ওখানেই শুয়ে আছে । আস্তে আস্তে যখন আগুন নিভে আসছে, হঠাৎ সেই

চাঁদনী রাতের আকাশে চারিদিক মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল, কেউ যেন এই জ্যোৎস্না ভরা আকাশে কালো রঙের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। আমি সবাইকে ডেকে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেলাম, এমন সময় শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি, সে কি প্রচন্ড বৃষ্টি, রাত তখন বারোটা। আমি ও রোহান একসাথে একই বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আর বাকিরা যে যার মত শুয়ে ঘুমাচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ খুব জোরে একটা বজ্রাঘাত পড়ল। রোহান চিৎকার করে উঠল । আমি শুয়ে শুয়ে জানলার দিকে তাকালাম, দেখলাম জানালার কাছে খালি গায়ে একটা লোক দেওয়াল ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি কঠিন গলায় বললাম, কে ওখানে কে? এমন সময় ঠক করে দেশলাই জ্বালানোর শব্দ হল। টেবিলের মোমবাতিটা তখনও জ্বলছে। এই ঘরে আমি আর রোহানই জেগে আছি, আর সবাই তো ঘুমাচ্ছে, ঘরে আর কেউ তো নেই । তাহলে কে জ্বালালো বাতি! কে সে? ততক্ষণে সেই ছায়ামূর্তি জানালার পাশ থেকে মিলিয়ে গেছে। আমরা দুজন ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি । চারিদিক কোন সাড়া শব্দ নেই পুরো নির্ঝুম হয়ে আছে । এমন সময় দেখতে পেলাম একটা হাত এসে সেই বাতিটা তুলে নিল । নিয়ে দরজার কাছ পর্যন্ত গেল । তারপর একটা গম্ভীর গলায় ভয়ংকর ভাবে বলে উঠলো - '' বাবু সবার খাওয়া হয়ে গেছে? ''আমি রোহানকে বললাম, দাঁড়া ! ওখানে কে আছে দেখে আসি। তখন রোহান আতঙ্কের স্বরে বলল না না ক্ষেপেছিস নাকি?

আমি বললাম আয় না, আয় দেখে আসি। রোহান গলা কাঁপতে কাঁপতে বলল, আমার খুব ভয় করছে। আমাকে ছেড়ে যাস না । আমি সাহস করে বললাম ভয় কিসের আমি তো আছি সাথে আয়। আমি জোর করে ওর হাত টেনে ধরলাম, দরজার দিকে এগোলাম দেখলাম সেখানে কেউ নেই। রোহানের হাতটা ছেড়ে কিছুটা আরো এগিয়ে গেলাম । কোথাও কারোর টিকিখানাও নেই । হঠাৎ রোহানের চিৎকার শোনা গেল । আমি গিয়ে দেখলাম রোহান আর সেখানে নেই । আমি মোবাইলের আলোটা জ্বালিয়ে চারিদিকে দেখলাম কেউ কোথাও নেই । ভয়ে, আতঙ্কে আমি ছুটে ঘরে এসে আর সবাইকে ডাকতে লাগলাম, দেখলাম তারাও সেখান থেকে উধাও । ভয়ে আমার পুরো শরীরটা যেন অবশ হয়ে গেল। উঠে দাঁড়াবার কোন জোর নেই। এমন সময় হঠাৎ আবার যেন কে বলে উঠলো, 'বাবু সবার খাওয়া হয়ে গেছে?', ভয়ে শরীর যেন আরো ঠান্ডা হয়ে গেল । মনে সাহস জুটিয়ে আমি ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম। সামনে দেখলাম, গাড়িটা দাঁড় করানো আর টাইগার ভিতরে শুয়ে। আমি তাড়াতাড়ি গাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে গাড়ি চালিয়ে সামনে যেতে না যেতেই দেখলাম সামনে একজন লোক হাফপ্যান্ট পড়ে দাঁড়িয়ে আছে ।

আমি ভালো করে দেখলাম এতো দশরথ ! কিন্তু এ কী তার চেহারা । তার মুখ শরীর সব জায়গায় কাটাকুটি হাতের আঙ্গুলের নখ বাঘের নোকের থেকেও বড়, তাতে রক্ত লেগে আছে। পা তার উল্টো দিকে। দশরথ তখন একটা ভয়ংকর পিশাচের রূপ ধারণ করেছে ।আমি গাড়িটা আরো জোরে চালাতে সামনে একটা গাছের সাথে ধাক্কা লেগে যায়। আমি দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ে যায়। তারপর অজ্ঞান হয়ে যাই।

রাত পেরিয়ে সকাল হয়ে গেল, যখন চোখ খুললাম দেখলাম, স্থানীয় লোক আমার চারপাশে, উঠে বললাম আমি কোথায়? তখন একটা বুড়ো বললো, তুমি কাল রাতে অজ্ঞান অবস্থায় এখানে পড়েছিলে আর তোমার গাড়িটা ওদিকে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে । তারপর ভাবলাম গাড়ির ভিতরে টাইগার ছিল তাহলে সেও মারা গেল।

কাল রাতে সব ঘটনাগুলো যখন গ্রামবাসীদের বললাম, তখন বয়স্ক সেই লোকটি বলল, তুমি যে দশরথ নামে লোকটির কথা বলছো বাপু সে তো আজ থেকে পাঁচ বছর আগে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। স্থানীয় লোকেরা বলে, আজও মাঝে মধ্যে দশরথকে দেখা যায় ওই জঙ্গলে, বাড়ির আশেপাশে। এসব শুনে ভয়ে সমস্ত শরীর ঠান্ডা হয়ে যায়। আজও প্রায় আমার বন্ধুদের কথা মনে পড়ে ।।

মেয়ে

সঞ্জনা খাতুন
দর্শন বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার

মেয়ে হয়ে জন্মালো মানে টাকার ধ্বংস মানো
মেয়ে মানেই পরিবারের বোঝা হয় কেন ?
মেয়ে হয়েছো মানে কোনো খারাপ সম্পর্কে জড়িয়ো না যেন
বাড়ি ফিরতে বেশি রাত কোরো না যেন ।।

মেয়ের বয়স কুড়ি মানে সে হয় বুড়ি
পাত্র খুঁজতে গেলে পরে পায় না সঠিক জুড়ি
মেয়েদের চাকরি-বাকরি করেই বা কি হবে?
পড়াশোনা করেও যে তাকে খুন্তি নাড়তেই হবে ।।

প্রতিবাদ না করলে মেয়েদের বলা হয় দূর্বল
আর প্রতিবাদ করতে গেলে তাদেরকেই বলে বাচাল
বাড়ি ছেড়ে পরের বাড়ি গিয়ে তাদের মানিয়ে নিতে হয় ,
এটাই যেন মেয়েদের পরম ধর্ম হয় ।।

এত করেও তারা আজও পরের বাড়ির মেয়েই রয়
নিজের বাড়ি বলে তাদের কিছুই না রয় ।।

তবুও তাদের আপন করে পরিবার গঠন করতে হয়
শত কষ্ট থাকলেও তাদের সবকিছু হাসিমুখে মেনে নিতে হয় ।
মেয়ে হয়ে জন্মালে বড়োই কষ্ট হয়
তবুও মেয়ের মধ্যেই প্রকৃতির স্বরূপ দর্শন হয় ।।

আমার আসল ঠিকানা

আয়েশা খাতুন
ইংলিশ অনার্স ষষ্ঠ সেমিস্টার

আমার ভাবতে বড় অবাক লাগে
আমিও একদিন থাকবো না,
কেউ যে আমায় আদর করে
আর কোনদিনও ডাকবে না।

আমিও যাব তুমিও যাবে
কেউ চিরকাল রবে না
এটাই যে চির সত্যি
বিধাতার বিধান চাইলেও
কেউ ধরে রাখতে পারবে না।

আমার বাড়ি তোমার বাড়ি
সবই রইবে পড়িয়া
এক টুকরো সাদা কাফন ছাড়া
আর কোন কিছুই যে
সঙ্গে নিতে পারবে না।

মা কাঁদবে বাবা কাঁদবে
শোকে মাতম করে
সবাই ব্যস্ত থাকবে সেদিন
তোমার রেখে যাওয়া
সম্পদের ভাগ লয়ে।

টাকা-কড়ি সকল ধনসম্পত্তি
কোন কাজে আসবে না
মাটির দেহ মাটি হবে
কবর হবে আমার আসল ঠিকানা ।।

আমি পারবো তো ?

শিবলী হক মোল্লা
আরবি অনার্স ষষ্ঠ সেমিস্টার

চটির ফিতেটা সোজা করতে করতে হঠাৎ শুনতে পেলাম, অনুগ্রহ করে শুনবেন 34626 ডাউন শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল লক্ষ্মীকান্তপুর যাওয়ার গাড়ি দুই নম্বর প্লাটফর্মে আসছে।

অপ্রস্তুতভাবে অনেকটা অনিচ্ছাভরে অলসভাবে উঠে দাঁড়িয়ে ট্রেনে উঠতেই।

(• এ মশলা পাঁপড়, চাই মশলা পাঁপড়।

• সামনে থেকে একজন ও দাদা জল নেবেন জল?

• ও দাদা! এই যে ব্যাগ এনেছি। খুউব ভালো..... নেবেন।

• এইযে দাদাভাই স্ট্রবেরি নেবেন স্ট্রবেরি?

• কেটে গেছে? মচকা লেগেছে? পুড়ে গেছে? খেলতে গিয়ে ছুলে গেছে .....?

• আমাদের প্যানোরেক্স বাম হাতে কাছে রাখুন আর লাগিয়ে দিন। ম্যাজিক দেখতে পাবেন। দেখবেন ব্যাথা ভ্যানিশ হয়ে গেছে আর নেই।

•এ মশলা আমলকী আছে মশলা আমলকী।

• এই লালু ভুলু কালু পেন গুলো চালু।)

ট্রেনের মধ্যে উঠেই এত্তোগুলো বাহারি কথার ধারা কানে ভেসে আসতে থাকে ওর। পকেট হাতড়ে দেখে একটা ১০ ও ৫ টাকার কয়েন পড়ে আছে। পুরনো Display ভাঙ্গা মোবাইলটা একবার সলজ্জভাবে বের করে দেখে কত সময় হলো। একটা দুমড়ে যাওয়া কমদামী বোতল বের করে এক... দুই ... তিন ঢোক পানি খায় তারপর সেটা হাতে ধরে থেকেই অপ্রস্তুতভাবে অনেকটা আনমনে ট্রেনের দরজা থেকে বাইরের দিকের আকাশটার দিকে তাকিয়ে ওর নিজের একটা ভাবনা দিয়ে সুন্দর ও সুনিপুন করে গড়ে তোলা একটা পরিপাটি জগতের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে। প্রাসাদ নয় কিন্তু মাথা গুঁজে থাকার মত একটা আশ্রয়স্থল আছে। বাড়ির দাওয়ায় বসে বুড়ি দাদিমা চুপি চুপি হাসছে কিন্তু চোখে পানি, কেন না আজ তার নাতিটা একটা সরকারি চাকরি পেয়েছে। কাছে ডেকে পাশে বসতে বললো আর মাথায় হাত বুলিয়ে ফোকলা গালে প্রাণ গলিয়ে দেওয়া সেই গালভরা হাসি হেসে বললো -ভাই রে! শুনিচি তুই নাকি চাকরি পেয়িচি। জানিস তো আমার আর কষ্ট নি। তোরে নে আমার খুব চিন্তা ছেলো। জানিস তো আমার না গ্যাসের ব্যারামের জন্যি আর কারো কাছে বলতি হবে না। তুই চাকরি পেয়িচি সন্দেবেলা আসার সময় আমার জন্যি এট্টু ওষুধ এনে দিবি আজ থেকে আর তোর বাপের বলবো না । ও সেরাজ আমারে এট্টু ওষুধ এনে দে নারে।

আরে দাদী তুমি চিন্তা করছো কেনো ?

তার আর চিন্তা নেই তোমার নাতি সব এনে দেবে।

মা! ও মা! ও মা! আব্বু কই? - বাজারে গেছে।

তোমার শরীর ঠিক আছে তো। এই নাও মুসাম্বি আনতে বলেছিলে না, এনেছি পেয়ারাও আছে। খুব মিষ্টি। জানো তো আজকে না একজনকে কিছু টাকা দিয়ে এসেছি শুনেছিলাম তার নাকি কয়দিন খাওয়া হয়নি। ব্যাগে কয়টা টাকা ছিল তাকে দিয়ে দিয়েছি।

তোকে নিয়ে আর পারা গেলো না। ভালো হয়েছে।নে হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নে।

ছেলেটা লাফিয়ে ওঠে আজকে তার ভাই যে কিনা আজ পর্যন্ত অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার ছোটভাই যদি ক্লাসের প্রথমে আসতে পারে তাহলে তাকে এই দেবে, ওই দেবে, এটা দেবে, সেটা দেবে, ওটা দেবে, একবার তো সাইকেলও দেবে বলেছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত তার একটাও পূরণ করতে পারেনি কিন্তু সেই অযোগ্য প্রতিশ্রুতি, ভঙ্গকারী, বড়ভাই আজকে তার প্রতিশ্রুতিমত স্মার্টওয়াচ গিফ্ট করেছে আজ তার কত আনন্দ তার ভাই সরকারি চাকরি পেয়েছে।

আজ সবার মনে আনন্দ উপছে পড়ছে। সবাই হাসিখুশি আছে আজ কেননা তাদের দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত ছেলেটি আজ সরকারি চাকরি পেয়েছে।কিন্তু এক সময় তারা ক্ষান্ত ক্লান্ত হয়ে বিছানা গ্রহণকরলো। চারিদিক নিশুতি রাত ঝিঁঝিঁ পোকা আপন মনে ডেকে যাচ্ছে।ঠিক ওই নিরিবিলি শান্ত পরিবেশ ভেদ কর গভীর ও শান্ত একটা গলা পাওয়া গেলো। একটু কাশির আওয়াজ করে --- “শুনেছি নাকি তুই চাকরি পেয়েছিস?”

-- মাথাটা চুলকে নীচু করে বলল হ্যাঁ পেয়েছি । ওই B.D.O. না কি সব তোমরা বলো না, ওই একটা পেয়েছি। দোয়া কোরো।

--- তা খুব ভালো। অনেক বড় হও।

এমন বলে নিঃশব্দে তিনি চলে গেলেন। কেনো জানি না আজ বাবার চোখের কোনটা যেনো চিক চিক করছে একটু জানালা থেকে আসা চাঁদের আলোয়।

হঠাৎ মনে হলো দীর্ঘকাল ধরে না পেয়ে আসা এক অতৃপ্তির স্বাদ যেন আজ পূর্ণতা লাভ করেছে।বাবারা এক অদ্ভূতপ্রাণী সারাটা জীবনধরে অক্লান্ত অসহনীয়, লাঞ্ছনার স্বীকার হয়ে আসা এবং সন্তানদের কাছে থেকে আজীবনকাল “ তোমার কাছে থেকে কোনো জিনিস একবারে চেয়ে পাওয়া যায় না”শুনে আসা বাবাটা আজ যেনো প্রাণ খুলে চিৎকার করে কিছু বলতেচায়। বলতে চায় যেন আজ আমি স্বার্থক।

হঠাৎ কর্কষ স্বরে কান বিদীর্ণ করা একটা আওয়াজ আরে দাদা জলের বোতল একটু ঠিক করে ধরুন না। দেখছেন না জলটা গায়ে পড়ছে। ট্রেন থেমে গেছে নামুন নামুন নামার রাস্তা দিন না মশাই! বিহ্বল ভাবে বাইরেটা উঁকি দিয়ে দেখে হলুদ ফলকে কালো রঙে মোটা করে লেখা আছে বারুইপুর জং। সম্বতি ফিরে পেয়ে বুঝলাম এবার নামতে হবে। আর পিছনের লোকেরা এক একজন এক একরকম ইচ্ছে মত কথা শুনিয়ে নিজের গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে । কেনো না সে ট্রেনের দরজাটি পুরো একাই দখল করে রেখেছে। নিচে নেমে ট্রেনের ছাউনির নিচে বসে বোকার মত ভাবছি “ইস যদি ভাবনাটা সত্যিই হতো”।

অজান্তেই মুখ থেকে একটাই কথা বেরিয়ে আসল “ আমি পারবো তো?”

ওমনি রাতজাগা চোখ দুটো অজান্তেই মনের সাথে ভাব পাতিয়ে অশ্রুদেরকে তাদের নিজ বাসস্থান থেকে গৃহচ্যুত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কোনো রকমে রুমালটা বের করে চোখ দুটো মুছে উঠে আবার রওয়ানা দিলাম টিউশনের দিকে।

এমন হাজারো একরকম ভাবে বলা যায় অসংখ্য বেকার শিক্ষিত যুবক ছাত্রের একই অবস্থা।

শেষ স্পর্শ

সামিম ইসলাম

আজকে বিকালে ঘুমটা যা জবরদস্ত হলো ।আলত করে একটু দুই হাত টান করে হাত দুটো মুটকে বিছানা থেকে নেমে যাওয়ার সময়ঘাড়টাঘুরিয়ে বললাম, রমেশ ওঠ এবার । তার কোনো সাড়াই নেই। শেষে যখন উঠছেনা দেখে আমি মুখ ধুয়ে জামা আর প্যান্ট টা পরে একটু সেন্ট গায়েমেখে, একেবারে দেখলে মনে হবে যে একজন ভদ্র সভ্য বাড়ির ছেলে। যাই হোক একটু বাইরে বাইপাসের দিকে যেতে এত সেজে গুজে যাচ্ছি মানে বলতে হবে না ,বিশেষ কারণ তো আছেই । সে আর বলতে হবে বলে মনে হচ্ছে না । তবু বলে রাখি আজ একজনের সাথে দেখা করার আছে সময়মতো না পৌঁছালে যে সে রেগে বোম হয়ে যাবে । আমি দরজাটা বাইরে থেকে ঠেলে দিয়ে চলে যাওয়ার সময় বলে গেলাম তুই সময়মতো উঠে আমাকে ফোন করিস । ও আদেও শুনেছে কি না জানি না । যাই হোক আমি না হয় ফোন করে নেবো ভেবে আমি আমার গন্তব্য স্থানের দিকে এগোলাম ।

রমেশ কে সে বিষয়ে বলতে গেলে হয়তো আজ শেষই হবে না ।শুধু এই টুকু বলে রাখি রমেশ আমার কলেজের বন্ধু তা নয়।আমাদের সেই ছোটো বেলা থেকেই বন্ধুত্ব । রমেশ আমাদের বাড়িতে আসতো ,আমিও রমেশদের বাড়িতে যেতাম। মাসিমা ও আসতো আমার মা আর মাসিমা দুই জনে খুব জমিয়ে গল্প করতো। একবার আমি রমেশদের বাড়িতে গিয়েছিলাম দুজনে খেলতে খেলতে কিছু একটা নিয়ে ঝগড়া বেধে যায়, ঝগড়া করতে করতে একটু মারামারি ও হয়ে যায় । রমেশ আমাকে একটা স্টিলের বাটি দিয়ে মারে, তখন মাসিমা বাড়িতে নেই, কোথায় একটা বেশ গিয়েছে । আমি তাকে আর কিছু না বলে কেঁদেবাড়িতে চলে আসি। মা জিজ্ঞাসা করতে আমি ঘটনাটা আর বললাম না বললাম পড়ে গিয়েছিলাম রাস্তায় । কিছুক্ষন পরে মাসিমা রমেশকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসে রমেশকে দেখেও আমি না দেখার ভান করলাম। তখন মাসিমা আমার মাকে বললো কই রামিজের মা কোথায় গেলে । আমার মা কাছেই ছিল সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়ালো, কিরে তুই এখানে, কি হলো! আর রমেশ কাঁদছিস কেন বাবা ? আমি রমেশের কান্নার কথা টা শুনে একটু চমকে গিয়েছিলাম । মাসিমা বললো, আর বোলোনা আমি একটু কাজে বাইরে গিয়েছিলাম আর রামিজ আর রমেশ আমাদের বাড়িতে খেলছিল। তার পরে কি নিয়ে দুই জনের মধ্যে মারামারি হয় তাতে রমেশরা মিজের মাথায় বাটি দিয়ে মারে । আমি আসতে দেখলাম রমেশ তো বসে কাদঁছে বললো এখনই আমাকে রামিজের কাছে নিয়ে চলো আমি ওর কাছে যাব । মা বললো কই এসব তো আমাকে রামিজ বলেনি । ততক্ষনে রমেশ আমার কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললো আমি আর এরকম কোনো দিন করবনা তুই আমাকে ক্ষমা করে দে। আমিও সবটা ভুলে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে আমি ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম । যাই হোক পরে আবার ঠিক হয়ে যায়।

বেশ কয়েক বছর পর নেমে আসে এক মর্মান্তিক শোকের ছায়া , একদিন রমেশ তার বাবা-মায়ের সাথে ঘুরতে যায়। তারা একটা বাস এ করে যাচ্ছিল ,বাসটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটা পোস্ট এর সাথে ধাক্কা মারে তাতে রমেশ -এর মা আর বাবা মারা যায় রমেশ এর চোট লাগে, কিন্তু প্রাণে বেচেঁ যায় সে । রমেশ এর জ্ঞান ফেরে হসপিটালে । আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাই, আমার বাবা আর রমেশের দাদু দুই জনে তাদের মৃত দেহ নিয়ে ফিরে আসে। আর আমি আর আমার মা রমেশ কে নিয়ে আসি আমাদের বাড়িতে। সেই থেকে রমেশ আমাদের বাড়িতে বেশির ভাগ সময় থাকতো । তার নিজের বলতে ছিল তার দাদু আর দিদা।আসলে তারা তার মায়ের বাপের বাড়িতে থাকতো । তার বাবা পালিয়ে বিয়ে করায়, তার বাড়ির থেকে তাকে ত্যাজ্য পুত্র করেছিল।

আমি গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলাম। কিন্তু সে এখনো এসে ওঠেনি। অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে ফোনটা বার করে ফোন করতে যাব এমন সময় চেনা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, আর ফোন করতে হবে না। পিছনে ফিরে দাঁড়াতেই, ওকে সামনে দেখে আমার গলা থেকে আর কোনো আওয়াজ বেরলো না আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলাম।

ও'ই শেষে আমাকে একটু হালকা করে নাড়া দিয়েবললো, তুই ঠিক আছিস তো!? আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম হমম আমি ঠিক আছি, কিন্তু তোর এতো দেরি হলো কেন ? আর বলিস না আসার সময় যা জ্যাম আর কি বলবো তাই দেরি হয়েগেছে। তখন সময় ০৫:৪৫ হবে। আমাদের এই খান থেকে যাদবপুর যাওয়ার কথা ছিল । আমি দেরি না করেই ট্রেন এর সময় টা দেখে নিলাম বারুইপুর থেকে কখন ট্রেন আছে। ০৬ :৪০ -এ বারুইপুর লোকাল আছে ওটাতেই যাওয়া হবে ঠিক করলাম।

ঐখানে একটা চা- কফির স্টল দেখে মায়া কে বললাম চল একটু চা খাওয়া যাক। চায়ের এক চুমুকে সমস্ত ক্লান্তি যেন দূর হয়ে গেল। চা আর তার সাথে সিগারেট টা ছেলেদের এক্কেবারে জমে যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি ওর সামনে সিগারেট খেতে পারছিনা। চা শেষ করে বিলটা দিয়ে দুজনে হাঁটতে লাগলাম, হাতে সময় আছে দেখে চলার গতি ধীর করে দিয়েছি দুজনেই। এভাবে একসাথে হেঁটে যে এতটা পথ অতিক্রম করব এটাই আমার কাছে অনেক পাওয়া।

আমরা দুজন দুজন কে চিনি প্রায় ২ বছর হতে গেল। সেই সামনে বছর একবার দেখা হয়ে ছিল, তবে এতটাসময় কাটানো হয়নি । আজ যে এতটাসময় কাটাতে পারবো এতেই আমি ওর কাছে ঋণী হয়ে দাঁড়িয়েছি।

শেষে ট্রেন এ উঠলাম ট্রেনের চাকার শব্দ আর তার সাথে বাঁশি বাজিয়ে যেনো ছন্দের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে লাগলো। আমি চুপ করে বসেছিলাম কোনো কথা বলছিনা দেখে ও বললো তোর মনে আছে সেই প্রথম দিন যেদিন তোর সাথে আমার পরিচয়হয়! হুম কেনো মনে থাকবে না ।

ও কিছু বলতে যাচ্ছিল...আমি থামিয়েদিয়ে বললাম, দাঁড়া রমেশ ফোন করছে। কলটা রিসিভ করতেই ওপার থেকে রমেশ বললো, কিরে তুই কোথায়? আমি তখন বুঝলাম যে আমি ওকে বলেছিলাম যে তুই আমাকে সময় মত কল করিস ও আদেও শোনেনি ও ঘুমিয়ে ছিল । বললাম আমি একটু যাদবপুরে যাচ্ছি আসতে দেরি হবে তুই ঘরে থাকিস । ও আর বেশি কিছু বললো না কলটা কেটে দিলো । ফোনটা নামিয়ে বললাম, কিরে কিছু বলছিলিস বল এবার। না থাক বলে একটু যেন অন্য রকম লাগছিল ওকে । বুঝলাম..ওর কথার পুরো উত্তর আমি দেইনি, আমি নিজেই বললাম তোর সাথে আমার প্রথম দিন বাসেই দেখা হয়ে ছিল মনে আছে? বলল হুঁম। তুই না থাকলে ওই দিনই হয় তো আমি ম... আমার মুখটা ও হাতদিয়ে চেপে ধরল । ওই কথা টা আর কোনো দিন ও বলবিনা, আমার মনে পড়লে বড্ড ভয় করে । আর অমন দিন যেন কখনো না আসে। আমার হাতটা ও ওর দুই হাতের মধ্যে নিয়ে আমার কাঁধে মাথা রেখে বললো, আমি তোকে হারাতে চাইনা। ওর কথার মধ্যে যেন ভয়- দুঃখ –মায়া সব টুকু জড়িয়ে আছে আমি আর বেশি কিছু বললাম না। এমন ভাবে বেশ অনেকটা সময় কেটে গেলো অবশেষে ট্রেন থেকে নেমে আমরা রাস্তায় লোকেদের মাঝখান থেকে হেঁটে চলেছি আমাদের গন্তব্যস্থলের দিকে ।

আমি ভাবছিলাম সেই দিনটার কথা সত্যি সেদিন ঠিক সময় মতো যদি ও আমাকে না টেনে নিত, তাহলে ঐ ছুটে আসা ট্রাকের নীচে পড়ে আমি হয়তো পরলোক গমন করতাম । সত্যি সেদিন ও আমার যে উপকার করেছে সে উপকার তো আমি সারা জীবনেও শোধ করতে পারবো বলে মনে হয় না।

তখন ০৭:২৫ আমরা কে.পি.সি-র সামনে এসে পড়েছি। ও মেডিকেল স্টুডেন্ট, ওর ওখানে কিছু দরকার ছিল। তাই আমি বাইরে মাঠে বসে আছি। আর ও পাঁচ মিনিটের জন্য ভিতরে গিয়েছে এই পাঁচ মিনিটটা যেন আমার কাছে পাঁচ ঘন্টার চেয়েও বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ও কাজ সেরে বার হলে ওখানে দুজনে বসলাম । খোলা আকাশের নীচে আর হালকা স্নিগ্ধ বাতাস বয়ে চলেছে। এভাবে বেশ অনেকক্ষণ কাটলো।

ওই দিনের পর তোর কাছ থেকে তোর ফোন নম্বরটা আমি চাইতেই পারতাম না আর আমাদের আর কথা হতো না । তুই তোর ফাইল টা ওই দিন অটো তে ফেলে না গেলে আমি আর ফোন করতেই পারতাম না আর কোনো

ফোন করে বলেছিস যে আপনি মায়া! আপনার ফাইল টা আমার কাছে, তখন আমি একটু স্বস্তি পেয়েছিলাম । তারপর চুপ চাপ কিছুক্ষনকাটলো ।

আমি আজ ঠিক করেছিলাম যে প্রায় দুবছর ধরে যে কথা টা বলার জন্য অধীর অপেক্ষায় আছি আজ আমি বলেই দেব । যে আমি ওকে শুধু বন্ধু হিসাবে নয় আমি ওকে জীবন সঙ্গিনী হিসাবে পেতে চাই। আমি বলতে যাব এমন সময় ও উঠে দাঁড়ালো, বললো চল অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম বাস এ করে যাই চল তাতে সুবিধা হবে এই সময়ডাউন ট্রেনে ভিড় হবে। সেই মতো বাস ধরে বারুইপুর ফিরছি । কেন জানিনা ও আমাকে কোনো মূল্যেই হারাতে চায়না, আমার হাতটা ও যেভাবে ধরে রেখেছে অনন্তকাল যেন এই ভাবেই ধরে রাখতে চায়। এভাবে কতক্ষন গেলো জানি না হঠাৎ খুব জোর একটা শব্দ আর ধাক্কা, তারপরেই বাসটার এক সাইট চেপে অন্য সাইটের দিকে ঠেলে এনে কাঁচ গুলো ভেঙে কে কোন প্রান্তে ছুটে চলেছে তার ঠিক নেই। তার সাথে কান্নার আর্তনাদ আর যন্ত্রণার চিৎকার তার পরেই আমার মাথার পিছনে অসম্ভব একটা তীব্র আঘাত। যন্ত্রণায় আমার সারা শরীর যেন হীম হয়ে এলো আমি শেষ বারের মতো মায়ার দিকে তাকালাম, শেষ দেখা আর শেষ স্পর্শ। সমস্ত মায়া ত্যাগ করে মায়া আমার হাত ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। আমার চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে এলো। তারপর হসপিটালের বেডে আমার জ্ঞান ফেরে তখন আমার পাশে রমেশ বসে আছে ।

জীবন ও পৃথিবী

সানোয়ার গাজী
ইতিহাস বিভাগ,চতুর্থ সেমিস্টার

আমি বেঁচে থাকতে চাই
যতদিন এ পৃথিবী গদ্যময়।
উঠোনে মৃত্যু আহুতি জানায়-
আয়ু ফুরিয়েছে আর নয়!

দাবানলে পুড়েছে শরীর
শুরু বাঁচার লড়াই
জীবনের নাম তো ফিরে আসা
গল্পটা সভ্যতার নয়।

পিছু হটতে-হটতে
আজ দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে,
জোর তবু শিরদাঁড়াতে
এ জীবন মৃত্যুকে রোজ দেখেছে।

পাশবিক হয়ে যেও না পৃথিবী
মানবিকতার ফুলে ফোটাও

.مكانة اللغة العربية في ولاية بنغال الغربية، الهند

الكاتب: شيخ اصغر علي

:المقدمة

.اصل اللغة الهندية

.تطورت اللغة الهندية مباشرة من لغة الهند القديمة وهي السنسكريتية

اللغة العربية هي إحدى اللغات السامية وهي لغة جميلة من حيث ألفاظها ومعانيها وبلاغتها وفصاحتها وقواعدها ولكن لما جاء الإسلام بالأرض العربية وجدت اللغة العربية روحها الأصلية لأنها زينت به تزيينا كثيرا وأكدها الإسلام كلغة حية لأنها لغة الإسلام والقرآن الكريم فانتشر الإسلام بأنحاء العالم ووصلت إلى الهند والأقاليم المختلفة لها وحكم الحكام المسلمون الهند أكثر من ثمانى قرون وبسببه أسست العلاقة العميقة بين اللغة العربية واللغات الهندية منها البنغالية والأردية والهندية والمليالامية وغيرها واللغة العربية أثرت اللغة البنغالية كثيرا لأن الألفاظ العربية لا تقل في هذه اللغة من 1700 لفظ ويسكن 27 شخصا مسلما في المائة في هذه الولاية وأنشأ كثير من المساجد والمدارس في المديريات المختلفة فيها ومع أنها أسست المدارس والكليات والجامعات التي أنشأتها الحكومة البنغالية تدرس فيها اللغة العربية وبالإضافة إليها هناك كثير من المدارس الأهلية لا تقل من 4000 مدرسة فيها حيث يتعلم الطلاب اللغة العربية ودين الإسلام وفي العصر الحاضر هناك اتجاهات تعلم اللغة العربية وكتاباتها من البننغاليين.

:الخاتمه

.إنّ لكلّ شيءٍ بداية ونهاية ونحن الآن نصل لنهاية

.وفي نهاية موضوعنا نسأل الله المولاناالعظيم ان يوفقنا لما يحب ويرضى

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আরবি ভাষার মর্যাদা।

লেখকঃ শেখ আসগর আলী

ভারতীয় ভাষা সরাসরি ভারতের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত থেকে বিবর্তিত হয়েছে।

আরবি ভাষা সেমেটিক ভাষাগুলির মধ্যে একটি, এবং এটি অর্থ, শব্দ, বাগ্মিতা এবং ব্যাকরণের দিক থেকে একটি সুন্দর ভাষা, কিন্তু যখন ইসলাম আরব ভূমিতে এসেছিল, তখন আরবি ভাষা তার মূল চেতনা খুঁজে পেয়েছিল কারণ এটি অনেক বেশি সজ্জিত করেছে, এবং ইসলাম এটিকে একটি জীবন্ত ভাষা হিসাবে নিশ্চিত করেছে কারণ এটি ইসলাম এবং পবিত্র কোরআনের ভাষা।

মুসলিম শাসকরা আট শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ভারত শাসন করেছেন এবং তার কারণেই তাদের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আরবি ভাষা এবং ভারতীয় ভাষা, যার মধ্যে বাংলা, উর্দু, হিন্দি, মালায়লাম, এবং অন্যান্য। এবং এর বিভিন্ন অধিদপ্তরে অনেক মসজিদ ও স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং যদিও এটি বাংলা সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল, যার মধ্যে আরবি ভাষা শেখানো হয়, এবং এর পাশাপাশি, 4000-এর কম নয় এমন অনেক প্রাইভেট স্কুল রয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীরা আরবি ভাষা এবং ইসলাম ধর্ম শেখে।বর্তমান যুগে আরবি ভাষা লেখা ও শেখার প্রবণতা রয়েছে বাঙালিদের মধ্যে।

উপসংহার:

সবকিছুরই শুরু এবং শেষ আছে এবং এখন আমার আলোচনা শেষ করতে যাচ্ছি ।

আমাদের বিষয়ের শেষে আমরা মহান প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে তিনি যা পছন্দ করেন এবং যাতে সন্তুষ্ট হন, তা করতে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

কলেজের অধ্যক্ষ মহেশয়ের সঙ্গে ছাত্র, শিক্ষকের একাংশ

কলেজের বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠান ২০২৩

সেমিনার

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর সঙ্গে যৌথ সেমিনার